নবদুর্গা।

অপূর্ব্ব পরিণয় রহস্য।

—০:*:০—

"বাঁশরী" ও "সর্ব্বনাশীর" গ্রন্থকার দ্বারা বিরচিত।

" A guilty conscience is the worst tormentor of life."

"ভূত। ভূত! ঐ ভূত! আমি ইহাকে—না—না—আমি—হাঁ—আমি ইহাকে খুন করিবার ইচ্ছা করিয়া ছিলাম ; সেই রাগে আমাকে খাইতে আসিয়াছে। ঐ—ঐ!—ঐ খায়! এই খেলে! ওঃ! ভূত। আপনি মরিয়াছিল! আপনি ভূত হইয়াছে! ** হাঁ—ভূত! নবদুর্গা পেত্নী! দুজনেই ভূত!" ১০২ পৃষ্ঠা।

কলিকাতা।

ব্যবসায়ী যন্ত্র।

শ্রী অমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯১ সাল।

মূল্য ছয় আনা। মফস্বলে ডাকমাশুল লাগিবে না।

(কলিকাতা- বি, কে, দাস এবং কোম্পানির নিকট প্রাপ্তব্য।

চূড়ায় বসিয়া কালপ্যাঁচা ডাকে। ভিতরের ভিত্তিতে লোণাধরা, স্থানে স্থানে থিলানে থিলানে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দীর্ঘ দীর্ঘ চিড়্, রুগ্ন পঞ্জরের ন্যায় প্রায় সমস্ত ইট্ বহির্গত। দ্বার গবাক্ষ সমস্তই অর্দ্ধভগ্ন। বহুপদী উর্ণনাভদলের অপূর্ব্ব শিল্পবিদ্যা-প্রসূত পোকা-ধরা বাগুরামালা কড়ীকাষ্ঠ হইতে ঝুলিতে আরম্ভ করিয়া জীর্ণ জানালার ভগ্ন চরণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। বড় বড় কৃষ্ণবর্ণ সর্পাকার সৌখীন ঝুলেরা অনেক দূর ব্যাপিয়া ঘরের কোণে কোণে, থাটালে থাটালে, বিবিত্র ঝালরের মত শোভা পাইতেছে। সমস্ত শোভাই অপূর্ব্ব!

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঘরের এক কোণে একটা ঝুলবর্ণ ভাঙ্গা ধুচুনীর উপর একটী মৌরাসী প্রদীপ জলিতেছে। এক-ধারে একটা নারিকেলমালা-ঢাকা পানীয় জলের মাটীর কলসী। তাহার পার্শ্বে শিল, নোড়া, বঁটী, মুড়ো ঝাটা, মেটে পাথর, মুলোশাক, বেগুনের বোঁটা, তিন ঠাঁই দাগ্‌রাজী করা একটা কলঙ্কপড়া পিতলের লোটা, আর আর নানা প্রকার রকমারি গৃহস্থালী আস্‌বাব।

হঠাৎ এক পাল আর্সুলা এককালে চারিদিক হইতে ফর্ ফর্ শব্দে উড়িয়া প্রকৃতি দেবীকে যেন ভয় দেখাইতে লাগিল। দেয়ালের একটা ফাটালের ধারে একটা পাটলবর্ণ বৃহৎ তেঁতুলে বিছা ভয়ানক চেহারা বিস্তার করিয়া দেহপূর্ণ হস্তপদে আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘরটীকেই যেন বিভীষিকা দেখাইতেছে। গৃহাশ্রমী টিক্‌-টিকীরা বড় বড় গদীয়ানের মত হাত পা ছড়াইয়া দেয়ালের গায়ে স্থখাসন করিয়া ধীরে ধীরে লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে এক এক বার " ঠিক্ ঠিক্ " বলিয়া ঘরের নিস্তব্ধ ভাগ্যের

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। আস্থ্রার ফর্ ফর্, আর জেট্কুড়ীর ঠিক্ ঠিক্ শব্দ ভিন্ন গৃহে আর অন্য শব্দ কিছুই নাই।

ঘরের পূর্ব্ব ধারে একটা ছেঁড়া মাছুর। সেই মাদুরের উপর এক জন কৃষ্ণবর্ণ বাবু পেট উচুঁ করিয়া বসিয়া আছেন। ধূলায় ধূসর, ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ, এক খানা কৃষ্ণ কম্বল সেই মাদুরের উপর জড় সড় হইয়া বাবুর বালিশের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। বিছানার এক পাশে পচা দুর্গন্ধপূর্ণ, বহুকালের পুরাতন, এক দিকের কানা ভাঙা, একটা ছাতাধরা মাটীর মাল্সা বসিয়া রহিয়াছে। আর এক পাশে পূর্ব্ব বর্ণিত লোটার মত দ্বিতীয় লোটার মুখে একটা আব্লুসের নল পরা রামডাবা উপবিষ্ট। বাবু সেই রাম হুঁকাতে খাস অম্বুরীর ধোঁয়া খান, আর সেই ছাতাপড়া মাল্সাতে কাশীর উচ্ছিষ্ট পরিত্যাগ করেন। বোধ হয়, বাবুটীর কাশ রোগ আছে। চেহারাতেও সেই লক্ষণ অনুমান হয়। হাত পা সরু সরু, মাথাটী ডাগর, বুকের হাড় গুলি এক দুই করিয়া গণিয়া লওয়া যায়, উদরটী নবম মাস গর্ভবতী রমণীর উদরের মত বিলক্ষণ স্থূল। গলাতেও এক ছোট খাট একটী তাম্র মৃদঙ্গ,উভয় পার্শ্বে কণ্ঠ-বেষ্টনে লাল সূতা বাঁধা।

ঘরের পশ্চিম দিকের দক্ষিণ ধারে একটা উননের পাশে এক খানা সরা-ঢাকা কালো হাঁড়ী। প্রকাশ থাকুক, সেই ঘরখানি ছাড়া বাবুর আর দ্বিতীয় ঘর নাই। সেই এক ঘরেই রন্ধন, ভোজন, শয়ন, তিন কার্য্যই হয়।

ধ্যানমগ্ন মুনিঋষির মত নেত্র মুদ্রিত করিয়া মাদুলী-পরা মাদুরী বাবু আপন মনে হেঁট মুণ্ডে যেন কি চিন্তা করিতে-

ছিলেন। এক এক বার ঊর্দ্ধমুখ হইয়া বাম হস্তের অঙ্গুলীতে তুড়ি দিয়া "ওঁ সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্ পূর্ণম্ একমেবাদ্বিতীয়ম্" মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কম্বলখানির উপর দম্ রাখিতেছিলেন। এ লক্ষণে কাহার না বোধ হইবে যে, বাবুটী নবীন ধরণের এক জন ব্রহ্মজ্ঞানী ছাত্র, অথবা সর্ব্ব-বেদবেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বজীব-সমদর্শী, সর্ব্বপাপ-বহিষ্কৃত, এক জন পরম উপাসক, পরম ভক্ত ব্রাহ্ম। বাবুর নাম ফটীক চাঁদ অধিকারী।

রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড হইয়াছে। বাবুর হাই উঠিতেছে; পুনঃ পুনঃ জোর হাই। "ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্" মন্ত্রে তুড়ি দিয়া ফটীকচাঁদ সেই হাইদিগকে উড়াইয়া মোক্ষধামে প্রেরণ করিতেছেন; কেন না, সর্ব্বজীবের মঙ্গল বিধান করাই তাঁহার ধর্ম্মব্রত। শেষবার শুদ্ধ "একমেবা—" মন্ত্রের সহিত হাই তুলিয়া আপন উপাধান-কম্বলের গর্ভস্থল হইতে বাবু একটী দস্তার কৌটা বাহির করিলেন। তাহার মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণপদার্থ গ্রহণ করিয়া পৌস মাসের বদরীবৎ একটী গুলী পাকাইলেন। দেখিতে দেখিতে গুলীটী বাবুর করস্থল হইতে বদনস্থ, রসনস্থ, কণ্ঠস্থ, জঠরস্থ, শেষে পাকস্থ হইয়া গেল। বাবু যেন অতি কষ্টে দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বড় করিয়া একটী ঢোক্ গিলিলেন। লক্ষণে বোধ হইল, কাশ রোগের ঔষধ বলিয়া বাবু একটু একটু আফিং খান!

আধ ঘণ্টার অধিক অতীত হইয়া গেল, বাবু এক বারও তামাক খাইলেন না। আবার আধ ঘণ্টা যায়, এমন সময় সেই কম্বলের গর্ভ হইতে একটা কাগজের থলী বাহির হইল। বাবু তাহার মধ্য হইতে একটী বস্তু বাছিয়া লইয়া যথাসাধ্য শ্রমযত্নে

যথাপদ্ধতি প্রণালীক্রমে তাহা অন্য প্রকারে প্রস্তুত করিলেন। এই সময় সেই রাম ডাবাটীর এক বার মান রক্ষা হইল। বাবু সেই প্রস্তুত বস্তুতে অগ্নি চড়াইয়া খাস অম্বুরীর ধোঁয়া খাইলেন। যে কাগজে ঐ বস্তুর আশ্রয় দেখা গেল, সেই কাগজগুলি "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নামক পুস্তকের ছিন্ন পত্র! অহো! ধর্ম্ম পুস্তক না হইলেই বা অত যত্ন হইবে কেন? যাউক, বাবু খাস অম্বুরীর ধোঁয়া খাইলেন। (এখানে অম্বুরী মানে বড় তামাক।) লক্ষণে বোধ হইল, কাশীর ঔষধ বলিয়া বাবু একটু একটু গাঁজারও মৌতাত রাখেন। কিন্তু মজ্‌লিসে দেখা গেল, সে ঔষধে কাশী আরও বাড়িল! ধোঁয়া গিলিবার সঙ্গে সঙ্গে কাশীতে দম রাখাই দায় হইল!

যাহাই হউক, গঞ্জিকা-পূজার এক দণ্ড পরে বাবু আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন, "ওঁ সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্। যখন নিমন্ত্রণ করিয়াছি, তখন অবশ্যই আসিতে হইবে; অবশ্যই আসিবে।" একটু চিন্তা করিয়া আবার বলিলেন, "আসিবে ত বটে, কিন্তু কোথায় আসিবে?—এ ঘরে—" আর একটু চিন্তা করিয়া উরুদেশ চাপ্‌ড়াইয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "আচ্ছা বট্টে! বেশ কথা! এই-ই যেন সেই বাড়ী!—এই-ই যেম পঙ্কু বাবুর বাগান বাড়ী বট্টে! এই বাড়ী আমিই যেন কিনেছি। তবে আর ভাবনা কি বট্টে? আহা! দেখেছ! বিলিতী কেতায় কেমন চকবন্দী! যে ঘরে আমি বসিয়া আছি, এ ঘরটী কত্তই ডাগর! কত্তই ছবি, কত্তই কৌচ, কত্তই গালিচা, কত্তই তাকিয়া, কত্তই চৌকী, কত্তই ঝাড়, কত্তই আয়না, কত্তই পুতুল, কত্তই কি! আহা! দেখিলেই চক্ষু জুড়ায়! এই খানেই তিনি আসিবেন। যাহাকে

ভাল বাসি, তাহাকে নিমন্ত্রিতা হইয়া আসিতে দেখা বড় সুখের! আমি আজ সেই সুখ উপভোগ করিব। যখন আসিবেন, তখন আমি অন্য ঘরে থাকিব। একটু ভারী হইব বট্যে। আমার অনেক চাকর বেহারা থাকিবে কিনা, তাহারা খবর না দিলে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। তিনি আসিয়া খবর দিতে বলিবেন, বেহারারা সাহস করিবে না। আমি তখন চা খাইতেছি। কে আসিয়াছে, নাম লিখাইয়া আন্, বলিয়া বেহারাকে ধমক্ দিব। বেহারা নাম আনিবে, আমি অমনি ভিতরে ভিতরে বেহারাদিগকে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক রাখিবার হুকুম দিয়া, কি রূপে তামাক দিতে হইবে, কিরূপে বালিশ দিতে হইবে, কিরূপে আদব রাখিতে হইবে, একে একে সমস্ত সম্‌ঝাইয়া দিয়া এক গাছি বেত্রহস্তে শশব্যস্তে বাহিরে যাইব ত বট্যে, কিন্তু কি পোশাকে যাইব?—চোঃ!—যাও!—কিছুই না। স্রেফ্ এক খানি কালাপেড়ে ধুতি, একটী পিরাণ, একটী গর্ণেটের চোঘা!—বস্!—চটী জুতো।—আর না।—মাথা খোলা—ক্রস করা।—বস্! ছাফ্, সাদা!”

ফটীকচাঁদ বাবু এইরূপ আত্মগত পাতনামা করিয়া আরও কত কি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কল্পনা করিলেন। তেমন সুন্দর কল্পনা বোধ করি, সদা সর্ব্বদা মহাকবিদেরও হৃদয়মন্দিরে স্থান পায় না। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বাবু পুনর্ব্বার কি বলিবেন, আরম্ভ করিতেছিলেন, হঠাৎ থামিয়া এক বার কাণ খাড়া করিলেন। “ঐ না গাড়ীর শব্দ হইতেছে! ঐ তিনি আসিতে-ছেন বট্যে!” সানন্দকণ্ঠে এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া বাবুটী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সানন্দ কণ্ঠে আবার বলিতে লাগিলেন,

"বারাণ্ডা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাইব না ত! বারাণ্ডায় গিয়াই হেঁট হইয়া দেখি। আসিবেন না? এমনও কি হয় বটে? ভাল বাসি, পত্র দিয়াছি, স্বয়ং গিয়া দ্বারস্থ হইয়াছি, আসিবেন না? অবশ্যই আসিবেন। ঐ আসিয়াছেন বটে! ভাল বাসিলেই ভাল বাসিতে হয়। আমি তাঁহাকে ভাল বাসি, তিনি আমাকে ভাল বাসিবেন না? কেন বাসিবেন না? বাসিতেই হইবে। আজিই আমি তাঁহাকে ভালবাসা শিখাইব। নতুবা কে আর গ্রাহ্য করিবে ভালবাসা নিমন্ত্রণ?"

বাবু যদি সত্যই ছুটিয়া বারাণ্ডায় যান, অপঘাতমৃত্যুও হইতে পারে, এমন সঙ্কট স্থান হইতে এখন প্রস্থান করাই ভাল। বাবু কিন্তু "সত্যম্ জ্ঞানমনন্তমের" জোরে সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন। তাঁহাকে তখন বারাণ্ডায় যাইতে হইল না। গাড়ী তখন আইসে নাই। সুতরাং মনঃকল্পিত প্রাসাদের মনঃকল্পিত গালিচায় (আর্সুলাপূর্ণ পচা এক তালা ঘরে ছেঁড়া মাদুরে) শয়ন করিয়া ফটীক কেবল জাগুর কাটিতে লাগিলেন, "ভালবাসা নিমন্ত্রণ! ভালবাসা নিমন্ত্রণ!!"

—০:*:০—

দ্বিতীয় কল্প

কল্পনায় নিশাপ্রমোদ

"স খলু ধর্ম্মবুদ্ধ্যা বিষলতাবনং সিঞ্চতি, কুবলয়মালেতি নিস্ত্রিংশলতামালিঙ্গতি, কৃষ্ণাগুরুধূমলেখেতি কৃষ্ণসর্পমুপগূহতে, মহারত্নমিতিজ্বলদঙ্গারমভিস্পৃশতি।"

কাদম্বরী

পাঠক মহাশয়! বুঝিতেছেন কেমন? ফটীকচাঁদের নিবাস বীরভূম। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এই অঞ্চলে বিস্তর মহাকবি জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাগর্ব্বিত রাধাকৃষ্ণ-কবি জয়দেবের জন্মস্থান বীরভূম। ফটীকচাঁদ যে সেই কবিভূমি বীরভূমির কবিগুণের উত্তরাধিকারী হইবেন না, ইহা কে বলিতে পারে? লক্ষণ দেখিয়া আমাদের ত বিলক্ষণ বোধ হয়, ইহাঁর প্রতি কল্পনা-সতী কিছু সমধিক সুপ্রসাদবতী। তিনি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার জননীও তাঁহাকে একটী নাম দিয়াছেন, কালিদাস।

এ দিকে কিন্তু বড় গোল। তিনি আগা গোড়া কল্পনা করিয়া যেরূপ ফলাফল দাঁড় করাইলেন, তাহা যদি ঠিক তাঁহারই মুখে তাঁহারই কথায় বর্ণনা করা যায়, কেহই তুষ্ট হইবেন না। এক জনের মুখে অনর্গল বহু কথা শুনিতে অনেকেরই ভাল লাগে না। অতএব ফটীকচাঁদের ওরফে কালিদাসের কল্পনার ফলগুলি আমরা নিজে যত্নপূর্ব্বক একত্র কুড়াইয়া সর্ব্ব সমক্ষে ডালি দিব। সকলে দেখিবেন, স্বভাবের উপর এই কবিবরের কত দূর সুতীক্ষ্ণ নজর। স্বভাবের আট ঘাট ইহার কাছে সুদৃঢ়রূপে বদ্ধ। প্রকৃতিও ইচ্ছা করিলেই এই কালিদাসের বন্ধন এড়াইয়া পলাইতে পারেন না। সেইজন্য আমাদের ভয় হয়, পাছে আমাদের কোন অসাবধান পাঠক ফটীকচাঁদের কল্পনা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া যান।

মনে করুন, ফটীকচাঁদের কল্পিত সুরম্য হর্ম্ম্যে অনেক আলো জ্বলিতেছে। গাড়ী বারাণ্ডায় এক খানি গাড়ী পৌঁছিয়াছে। উপরের বৈটকখানায় দুটী নূতন বাবু ও দুটী স্ত্রীলোক বসিয়া

আছেন। স্ত্রীলোক দুটীর জামা গায়, তুফের দিয়া কাপড় পরা, মাথায় চিকণ কবরী বদ্ধ, তাহাতে সোণারূপার চিড়িয়া-খানা। সুতরাং মস্তকে বস্ত্র দিবার ব্যাঘাত; বিশেষতঃ ঢাকা থাকিলে সে বাহার, সে সৌভাগ্য লোকে দেখিবে কিরূপে?

বাবু দুটির মধ্যে একটির নাম শশিকান্ত, আর একটির নাম নীলকান্ত। রমণী দুটির মধ্যে বড়টীর নাম মন্দাকিনী, ছোটটীর নাম নবদুর্গা। বড়টীর বয়স অনুমান বত্রিশ বৎসর, ছোটটীর বয়স অষ্টাদশ বৎসর। রূপে বড়টী অপেক্ষা ছোটটী অধিক সুন্দরী।

মনে করুন, বাবুর বেহারা অভ্যাগতদিগের নাম লইয়া বাবুকে গিয়া দিল। বাবু তাঁহার পূর্ব্বকল্পনামত স্রেফ্ সাদা পোসাকে বৈটকখানায় বার দিলেন। কল্পনা-ক্ষেত্রে তাঁহার মুখ যেমন প্রফুল্ল ছিল, কার্য্য-ক্ষেত্রে তেমন নয়; কিছু ম্লান, বিবর্ণ, বিষণ্ণ। একটীকে আশা করিয়াছিলেন, চারিটী উপস্থিত। তথাপি মনের ভাব গোপন করিয়া তিনি দন্ত বিকাশপূর্ব্বক "আসতে আজ্ঞা হউক" ইতি মিষ্ট বাক্যে বিনম্রভাবে বিনত শরীরে সকলের অভ্যর্থনা করিলেন। পরস্পর কুশল প্রশ্নোত্তর বিনিময়ের পর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্ম সভার সংবাদ কি? স্ত্রী জাতির স্বাধীনতা লইয়া যে বিবাদ হইতেছিল, তাহার মীমাংসা কি হইল?"

শশিকান্ত উত্তর করিলেন, "তাহার মীমাংসা হইবে না। রুক্মিণী-হরণের সময় শিবিকার ভিতর শিশুপাল যেমন স্বাধীনতা লইয়াছিল, কালে আমাদিগকেও নারীজাতির কাছে সেইরূপ স্বাধীনতা লইতে হইবে।"

বাবু একটী নিশ্বাস ফেলিয়া তাঁহাদের সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে চিন্তিতভাবে উপবেশন করিলেন। এক জন বেহারা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার তিন দিকে তিনটি তাকিয়া সাজাইয়া দিল; বাম দিকে সট্কা পড়িল; অভ্যাগত বাবুদিগের জন্য দুটি স্বতন্ত্র বাঁধা হুঁকা।

ফটকে ছক্কড় হাজির ছিল। গাড়োয়ান চীৎকার করিয়া বলিল, "বাবু! এক ঘণ্টা সে জাস্তি হো গিয়া।"

ফটীকচাঁদ বাবু স্বয়ং বারাণ্ডায় গিয়া আদেশ করিলেন, "এই সি তো হোতা হ্যায়, যানা আনাকা ভাড়া, দুসর জলপানী মিলেগা জুদা।"

গাড়োয়ান নিস্তব্ধ হইল। বাবু ফিরিয়া আসিয়া গল্প করিতে বসিলেন। ঘন ঘন দৃষ্টি নবদুর্গার প্রতি। কিয়ৎক্ষণ পরে এক জন বেহারাকে হুকুম দিলেন, "এই বাবুদের খাতিরের যেন কোন ত্রুটী হয় না। জলখাবার, তামাক, পান, সমস্তই যেন ঠিক থাকে। আহার প্রস্তুত হইলে আমি যেন সংবাদ পাই।" বেহারাকে এইরূপ আদেশ দিয়া শশিকান্তকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "স্বাধীনতার সাপক্ষ হইলেও স্ত্রীলোকদিগকে অধিকক্ষণ সদর বৈটকখানায় রাখা ভাল দেখায় না। আমি ইহাঁদিগকে অন্দরে লইয়া যাই; একটু পরেই আবার ফিরিয়া আসিব, আপনারা কিছু মনে করিবেন না।" বাবু ফটীকচাঁদ এইরূপ শিষ্টাচার দেখাইয়া নবদুর্গাকে কহিলেন, "দেবি! গাত্রোত্থান করুন।" মন্দাকিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ঠাকুরাণি! অনুগ্রহ করিয়া আপনিও আমার সঙ্গে আসুন।"

অনুরোধে বাধ্য হইয়া মন্দাকিনী ও নবদুর্গা ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ফটীকচাঁদের সঙ্গে একটী যবনিকা ভেদ করিয়া অপর গৃহে, তাহার পর ক্রমে ক্রমে আর দুটী গৃহ পার হইয়া, পঞ্চম গৃহে উপস্থিত হইলেন। সে গৃহটীও বিলক্ষণ প্রশস্ত, বিলক্ষণ সুসজ্জিত। রমণীরা চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া শত শত বাহারের সহস্র সহস্র তারিফ করিতে লাগিলেন। গৃহে এক খানি ছবি ছিল। অর্দ্ধবসনা দময়ন্তী-সতী বনে নিদ্রা যাইতেছেন, নল রাজা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন, পার্শ্বে একখানা খাঁড়া পড়িয়া রহিয়াছে। ছবিখানি দেখিয়া নবদুর্গার মনে রাগ হইল। মনের রাগ ক্রমে ক্রমে মুখে আসিল। অনুরুদ্ধ না হইয়াও নিকটস্থ একখানি আসনের উপর নবদুর্গা বক্রভাবে উপবেশন করিলেন। মন্দাকিনীর দিকে চাহিয়া তাচ্ছীল্যস্বরে কহিলেন, "ছিঃ! পুরুষজাতি বড়ই নিষ্ঠুর! এজাতির শরীরে দয়ামায়া নাই! এখন অবধি প্রতিজ্ঞা করিব, এজন্মে আর আমি বিবাহ করিব না।"

রহস্য করিবার উত্তম অবসর পাইয়া, মন্দাকিনীকে বসিতে বলিয়া, ফটীক বাবু স্বয়ং একখানি মখ্‌মলের আসনে উপবেশন করিলেন। আড় নয়নে ঈষৎ কটাক্ষ করিয়াই নবদুর্গাদেবী আপন আসনখানি অন্যদিকে দুই হাত সরাইয়া লইলেন। বাবু ফটীকচাঁদ আপনার আসনটী নবদুর্গার আসনের সম্মুখে লইয়া দিয়া, তাঁহার দিকে একটু হেঁট হইয়া, একটু হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নবু! তবে এজন্মে তোমার কি এক বার বিবাহ হইয়াছিল?"

চৌকীখানি আরও এক হাত পশ্চাতে সরাইয়া লইয়া নবদুর্গা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?—কেন এমন অদ্ভুত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ?"

"কেন?"—হাস্য করিয়া ফটীক বাবু কহিলেন; "কেন? এই যে এই মাত্র তুমি বলিলে, প্রতিজ্ঞা করিবে, এ জন্মে 'আর' বিবাহ করিবে না। সেটি তবে কেমন কথা? এক বার বিবাহ না হইলে কি কেহ কখনও এ জন্মে 'আর' আমি বিবাহ করিব না বলিতে পারে?"

নবদুর্গা কিছু লজ্জিত হইলেন। ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "অত শত আমি বুঝি না। তোমার মতন অমন ন্যায়শাস্ত্র আমি জানি না। চির দিন জানিতেছ, আমি অবিবাহিতা কুমারী, আমার কথায় কি ছল ধরিতে আছে?"

ফটীক চাঁদের পরমানন্দ। তাঁহার কল্পিত জামার পকেটে একটী কল্পিত ঘণ্টা ছিল। লঘু হস্তে সেইটী বাহির করিয়া "ওঁ সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্" মন্ত্রে তিন বার ধ্বনি করিলেন। এক বার হাই তুলিয়া সহাস্য আলস্য ভাঙ্গিয়া সহাস্য আস্যে কহিলেন, "বাঁচিলাম! তোমার কথা শুনিয়া প্রাণটা একবারে দমিয়া গিয়াছিল! এক দিন—"

বাবুর কথা শেষ হইতে না হইতেই ঘণ্টাধ্বনির উত্তর আসিয়া পৌঁছিল। সর্দ্দার বেহারার হস্তে মজ্‌লিসে বোতল গেলাস উপস্থিত! মাঘ মাস, অল্প অল্প শীত আছে, শ্রীহট্টের শীতলা কমলা দেবীরাই ত এই সময় সৌখীন বাবুদের রসনা ওষ্ঠ শীতল করেন জানি; কিন্তু আমাদের ফটীক চাঁদ বাবুর কল্পনা-সংসারে এমনি'জলজলাট্ যে, সেই মাঘ মাসে এক দুর্লভ্ বস্তুর শুভা-

গমন। এক ছোঁড়া উড়িষ্যাবাসীর হস্তে এক খানি সানকে করা আট দশটী খাসা বোম্বাই আম সর্দ্দার বেহারার পশ্চাৎ হইতে উঁকি মারিতে লাগিল। সময়ে রাশি রাশি আঙ্গুর বেদানার সহিত তাহারাও আসিয়া হুজুরে পেস হইল।

নবদুর্গা না খাইলে ফটীক বাবু খাইবেন না। তিনি বার বার জেদ করিতেছেন, নবদুর্গা কেবল হাসিতেছেন। নবদুর্গার ইচ্ছা কি? সত্যই কি তিনি মদ্য পান করেন না? করেন কি না, সে কথা জানি না; কিন্তু নবদুর্গার ইচ্ছা, মন্দাকিনী যদি খান, তাহা হইলে তিনি দুই এক পাত্র প্রসাদ পাইলেও পাইতে পারেন।

ফটীক বাবু আবার অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে সুরা-পানে নিষেধ নাই, একটী শ্লোক পড়িয়া সে প্রমাণও দিলেন। "শক্তি বিনে মুক্তি নাইরে ভাই!" এই ভাবের একটী গান গাইয়া মুক্তিতন্ত্রের সারভাগ পর্য্যন্ত সপ্রমাণ করিলেন। তথাপি নবদুর্গা রাজি হইলেন না। মন্দাকিনীর উপর আস্তাই পড়িল। মন্দাকিনী দস্তুর মত করযোড় করিয়া বিবিয়ানা স্বরে বিনীত ভাবে কহিলেন, "মহাশয়! আমাকে মাপ করুন! বয়েস কিছু ভারী হইয়াছে, আমার নাড়ীতে ব্রাণ্ডি মদটা সহ্য হয় না।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ফটীকচাঁদ বাবুর একটী নাম কালি-দাস। কালিদাসের বুদ্ধির কাছে স্ত্রীলোক পার পাইয়া যায় কতক্ষণ? মন্দাকিনীর কথায় ফটীক চাঁদ একটু সূত্র পাইলেন। সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে স্ফীত হইয়া গম্ভীরভাবে কহিতে লাগিলেন, "আচ্ছা, তাহা যদি সহ্য না হয়, অন্য যাহা কিছু অভিলাষ থাকে, অনুমতি করুন। দাতাকর্ণকে ছলিবার

সময় নারায়ণ যখন বৃদ্ধ অন্ধ ব্রাহ্মণ বেশে একাদশীর পারণের নিমিত্ত উপস্থিত হন, কর্ণ তৎকালে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

'পক্ষী মাংস মৃগ মাংস যেবা রুচি হয়,
আজ্ঞা কর, কোন মাংস আনি মহাশয়।'

আমিও আপনাকে সেইভাবে নিবেদন করিতেছি, আপনার যাহা অভিরুচি, অনুমতি করুন, তাহাই আমার প্রস্তুত।"

মন্দাকিনী মৃদুস্বরে কহিলেন, "কেহ অনুরোধ করিলে মাঝে মাঝে আমি একটু একটু সেরী খাই।"

তথাস্তু মন্ত্রে দুই প্রকার মদিরার মজলিসে বরণ হইল। সে শোভা কেমন?—কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তীর বর্ণনা অনুসারে—

মাথায় টোপর দিয়া বসিল দম্পতী
কৌতুকে যৌতুক দেয় যতেক যুবতী।।

এখানে "যতেক যুবতী" নাই। একটী কাশ রোগগ্রস্ত পুরুষ, একটী প্রৌঢ়া রমণী, আর একটী স্নবীনা সুন্দরী ব্রাহ্মিকা যুবতী। ইহারা তিনটীতে একত্র হইয়া আসরোপবিষ্ট টোপর-শীর্ষ নব দম্পতীকে যথাবিধি যৌতুক প্রদান করিতেছেন। ইত্যবসরে এক জন রক্তোষ্ণীষধারী বার্ত্তাবহ আসিয়া সংবাদ করিল, "হুজুর! যে দুটী বাবু বৈটকখানায় বসিয়া আছেন, তাহাদের আহার সামগ্রী প্রস্তুত।"

হুজুর আর বিলম্ব করিলেন না। পান পাত্রকে আর এক-বার মর্য্যাদা দান করিয়া এক গাছি ক্ষুদ্র বেত্র হস্তে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। দুই তিন পদ অগ্রসর হইয়াছেন, চঞ্চলভাবে পশ্চাৎ হইতে নবদুর্গা বলিয়া উঠিলেন, "যে স্থানে আহারের আয়োজন হইয়াছে, সে স্থানে কি আমরা যাইতে পারি না?"

পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া ফটীক বাবু কহিলেন, "আপত্তি নাই; কিন্তু সদর বাটীর বৈঠকখানা, সেখানে স্ত্রীজাতির উপস্থিত থাকা ভাল দেখায় না।"

নবদুর্গা জিদ্ করিয়া কহিলেন, "ভাল দেখায় না সত্য, কিন্তু সেখানে ত অপর লোক আর কেহই নাই, বিশেষ তুমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিতেছ; আমরা না হয় কিঞ্চিৎ অন্তরাল হইতে অভ্যাগতের আহার ক্রিয়া সন্দর্শন করিব।"

আর আপত্তি চলিল না। বাবু ফটীকচাঁদ সম্মত হইলেন। পূর্ব্বে একটু ভাবিয়াছিলেন, যাহার সঙ্গে প্রতিযোগিতা, তাহার সম্মুখে নবদুর্গাকে আর বাহির হইতে দিবেন না। শেষে আবার ভাবিলেন, নবদুর্গাকে ছলে কৌশলে করতলস্থ করা চাই; এরূপ স্থলে তাহার অনুরোধে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা ভাল নয়। এই ভাবিয়াই অসঙ্কোচে সম্মতি দান করিলেন।

কল্পনাবলে ফটীকচাঁদ, মন্দাকিনী, ও নবদুর্গা, তিন জনে একত্রে অভ্যাগতদিগের ভোজন স্থানে উপস্থিত।

যেখানে বাবু দুটী ভোজনার্থ উপবেশন করিয়াছেন, তাহার ঠিক সম্মুখে এক খানি ইজি চেয়ার পড়িল। বাবু ফটীকচাঁদ সেই প্রশস্ত চৌকীতে আড় হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। মন্দাকিনী ও নবদুর্গা, উভয়ে নিকটবর্ত্তী একটী দরজার পার্শ্বে একটু গাঢাকা হইয়া দাঁড়াইলেন।

রৌপ্যপাত্রে পলান্ন পরিবেশিত হইয়াছে। রৌপ্য পাত্রে বিবিধ পক্ব মাংস প্রস্তুত রহিয়াছে। বাবুরা আহার করিতেছেন। ফটীক বাবু এক বার মাথা উঁচু করিয়া দেখিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "পায়স কৈ? পায়স কোথায়? পায়স বোলাও! সব বোলাও।"

মাংস পরিবেশনের অগ্রে পায়স আনিতে হইবে, পাত্রহস্ত ব্রাহ্মণ ইহা ভাবিয়া সন্দেহ-সঙ্কোচে ইতস্ততঃ করিতেছিল; "মিঠাই বোলাও" বলিয়া রক্তাক্ষি ফটীকচাঁদ আরও রক্তাক্ষি হইয়া সক্রোধে তাহার পৃষ্ঠদেশে তিন বেত বসাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণের হস্তস্থিত মাংসপূর্ণ রজত পাত্র ঝনাৎ করিয়া বারাণ্ডার উপর পড়িয়া গেল! বেচারা রোরুদ্যমান বদনে আপন পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে রন্ধনশালার দিকে ছুটিয়া পলাইল। এই ব্যাপার দর্শনে মন্দাকিনী দেবী দ্রুতপদে অগ্রগামিনী হইয়া ফটীক বাবুর হস্ত ধারণ করিলেন।

বাবু ফটীকচাঁদ ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে চেয়ারখানিকে অবসর দিয়া গৃহের দিকে পাঁচ সাত চরণ অগ্রসর হইলেন। হটাৎ কল্পনাকুহকে কি কথা যেন স্মরণ হইল, এই ভাবে দাঁড়াইয়া এক জন বেহারাকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন, "আহারের পর বৈঠকখানার দালানের উত্তরের কামরায় যে তিন খানা কৌচ আছে, তাহার দুই খানা কৌচে বাবুদের শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিস্। দেখিস্, বিছানা যেন উত্তম পরিপাটী হয়। খবরদার! খুব হুঁসিয়ার!"

"যো হুকুম" বলিয়া হিন্দুস্থানী বেহারা দস্তরমত সেলাম বাজাইল।

শয্যা-পারিপাট্যের আদেশ প্রদান করিয়া বাবু ফটীকচাঁদ কিঞ্চিৎ অন্তরে আগুয়ান হইয়া দৌবারিকদিগের জমাদারকে আহ্বান পূর্ব্বক তাহার কাণে কাণে কি কথা বলিলেন। জমাদার যেন একটু শিহরিল। কিন্তু হজুরের হুকুম, অবশ্যই শিরোধার্য্য, সুতরাং শির নোয়াইয়া আদব পৌঁছাইল। হজুর

তখন এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া বিলাসকক্ষে প্রবেশিলেন। তথায় পানাহার সমাপন করিয়া তিন জনে নানা প্রকার কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। ও দিকে বাবুরাও আহারান্তে বিশ্রামার্থে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাহিরের বৈঠকখানায় একটা গোল উঠিল। এক স্বর বলিতেছে, "এ ঘরে স্ত্রীলোকেরা শয়ন করিবে, তোমরা বাহির হইয়া যাও।" আর একটী উচ্চ স্বর বলিতেছে, "ফটীক-বাবু আমাদের এই ঘরে শয়ন করিতে বলিয়া দিয়াছেন, আমরা উঠিব না।" কথায় কথায় ক্রমশঃ কথা বাড়িয়া উঠিল। উভয় পক্ষেই উচ্চ বাক্য বিনিময়। শেষে প্রথম বক্তার ক্রোধ বৃদ্ধি; বল প্রয়োগের উপক্রম; প্রকৃত যুদ্ধ বাঁধিবার স্বস্তিবাচন।

ফটীকবাবু সেই গোলযোগ শ্রবণ করিয়া মনে মনে হাস্য করিতে লাগিলেন।

পাঠক মহাশয় স্মরণ করিতে পারিবেন, অভ্যাগত বাবুদের ভোজনের সময় এক জন জমাদারের কাণে কাণে ফটীকচাঁদ বাবু কল্পনাবীজে যে মন্ত্র ঝাড়িয়া আসিয়াছিলেন, তাহারই ফল ফলিতেছে। উভয় পক্ষে হাতাহাতির উপক্রম! ফলে তত দূর গড়াইল না। কল্পনার চক্ষু বিস্তার করিয়া বাবু ফটীকচাঁদ দেখিলেন, তাঁহার দরোয়ানেরা মহাক্রোধে শশিকান্ত ও নীলকান্তকে গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিল। সদর দরজায় চাবী পড়িল। ফটীক নিশ্চিন্ত হইলেন।

এ দিকে মন্দাকিনীর কিছু অসুখ বোধ হইতেছে; তিনি শয়নের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। স্বতন্ত্র একটী সসজ্জিত

গৃহে ফটীকচাঁদ তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মন্দাকিনী শয়ন করিলেন। শয়ন মাত্রেই নিদ্রা।

উত্তম অবসর প্রাপ্ত হইয়া ফটীকচাঁদ বাবু সহর্ষ বদনে নবদুর্গার কাছে আসিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "সুশীলে! অনেক দিন অবধি আমি তোমার আরাধনা করিয়া আসিতেছি, ভক্তিভাবে পূজা করিতেছি, চারুশীলে! তুমি কি আমার হইবে না? চিরদিনই কি আকাশকুসুমবৎ আশাকে আশ্রয় করিয়া অকূলে রোদন করিতে হইবে? আমি তোমাকে প্রাণ মন সমস্তই সমর্পণ করিয়াছি, প্রাণের সঙ্গে ভাল বাসিয়াছি; প্রাণময়ি! শুধুই কি সেই সমর্পণ ও ভালবাসা মাত্রই সার হইবে? প্রাণপ্রতিমে! সত্য করিয়া বল দেখি, তুমি কি আমার হইবে না?"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চপলার ন্যায় মৃদুমন্দ হাসিয়া নবদুর্গা উত্তর করিলেন, "কেন প্রিয়ম্বদ? কেন আমি তোমার হইব না? তুমি ভিন্ন এ সংসারে আমি আর তবে কাহার হইব?"

আহ্লাদে এক কালে চলচ্চিত্ত হইয়া ফটীকচাঁদ কহিলেন, "চরিতার্থ হইলাম! অনুগৃহীত হইলাম! সুধামুখি! আমার প্রাণে একটা বড় ভয় ছিল। কারণ কি জান? লোকে বলে, আমি কিছু কৃশ, আমি কিছু মলিন বর্ণ; তুমি যেন ঠিক বিদ্যাধরীর মত রূপবতী; হয়ত তুমি আমাকে পছন্দ করিবে না। সেই ভয়েই আমি জড়সড় হইয়া থাকিতাম। আজ সেই ভয়, সেই সংশয় একেবারেই দূর হইল। আমি নির্ভয়ে চরিতার্থ হইলাম!"

পূর্ব্ববৎ হাস্য করিয়া নবদুর্গা কহিলেন, "আমারও মনে একটা বড় ভয় ছিল। তুমি নব রসের পূরন্ত ভাণ্ডার; তোমার

কাছে এই নবদুর্গা যেন একটা বিষ-লতা মাত্র। রসরাজ! লোকে বলে, নবদুর্গা তোমার দাসীর যোগ্যও হইতে পারে না। তুমি যে এখন দয়া করিয়া দাসীকে পরিত্রাণ করিবে অভয় দিলে, ইহাই আমার পরম ভাগ্য!"

বদন গম্ভীর করিয়া ফটীকচাঁদ কহিলেন, "সুধাসাগর! তুমি জলধি-মন্থনের সার অমৃত। কে বলে তুমি বিষ-লতা? যদিই তুমি বিষ হও, তথাপি আমি তোমাকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া নীলকণ্ঠের ন্যায় নীলকণ্ঠ হইয়া থাকিব; কদাচ পরিত্যাগ করিব না।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া ফটীকচাঁদ একটু কি চিন্তা করিলেন। বাবু ফটীকচাঁদ এক জন কবিবর কি না, তাঁহার মাতৃদত্ত একটী নাম কালিদাস কি না; তিনি তৎক্ষণাৎ এক জন মহাকবির একটী মহাকবিতার এক চরণ উদ্ধার করিয়া দিলেন।

"অদ্যাপি নোহ্যতি হরঃ কিল কালকূটং।"

বালক বালিকারা নিদ্রিতাবস্থায় যেমন দ্যায়লা খেলা করে, ফটীকচাঁদের মুখে ঐ শেষ কথাটী শুনিবামাত্র নবদুর্গার ওষ্ঠে সেইরূপ একটু হাসি দেখা দিল। সেই হাস্যের সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্নভাবে নবদুর্গার চক্ষু ঝিমাইয়া পড়িল।

সেই নিদ্রাচ্ছন্ন কোমল মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে ফটীকচাঁদ যেন কল্পনারথে চড়িয়া স্বর্গে যাইতেছিলেন, নবদুর্গার একখানি হাত ধরিয়া যেন আদর করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় তাঁহার আসল গৃহের কড়ীকাষ্ঠের এক থাটালের দুই খানা ইষ্টক ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া পড়িয়া গেল! একখানা শয্যার উপর, আর একখানা একটু দূরে! অকস্মাৎ ইষ্টকপতনে ফটীকচাঁদের সুখস্বপ্ন, সুখের

কম্পনা ভঙ্গ হইয়া গেল! তিনি চমকিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন! (ভুঁড়ির উপর পড়িলেই হয় ত অক্কা পাইতে হইত!) ইষ্টকাঘাতে তাঁহার জীবনসম্বল অহিফেন-কৌটাটী চূর্ণ, ডাবা হুঁকাটীও ভগ্ন, ঘরে জলে জলময়! শোকের সীমা নাই! ইহার উপর আরও বিপদ! যে খাটা-লের ইষ্টক খসিয়া পড়িল, সেইখানে একটা বৃহৎ তেঁতুলে বিছা বিরাজ করিতেছিল; আশ্রয়হীন হওয়াতে সেটাও সেই সঙ্গে সড়াৎ করিয়া পড়িয়া গেল! পতনকষ্টের আক্রোশ কাহার উপর ঝাড়ে?—ফটীকচাঁদের বাম বাহু বেষ্টন করিয়া সজোরে কাম্‌ড়াইয়া ধরিল! দারুণ দংশনে ফটীকচাঁদ এককালে যেন যম-যন্ত্রণায় অস্থির হইলেন!

বাবু ফটীকচাঁদ, ওরফে কালিদাস, যখন কল্পিত উদ্যান-প্রাসাদে নবদুর্গার সমাগম-স্বপ্ন উপভোগ করিতেছিলেন, বাস্তবিক তখন রাত্রিকাল। তাঁহার ভগ্নগৃহে ধুচুনীর উপর মিট্ মিট্ করিয়া একটী দুর্গাপ্রদীপ জ্বলিতেছিল। মাটীর কলসী, কাল হাঁড়ী, কাশীর মাল্‌সা, আর আবর্জ্জনারা যথা যথ-স্থানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া গৃহটীকে দস্তুরমত উজ্জ্বল করিতেছিল কোথায় বা উদ্যান, কোথায় বা অট্টালিকা, কোথায় বা নবদুর্গা, আর কোথায় বা কি! সমস্তই ফক্কিকার! রামডাবার দুর্গন্ধ জলে অভিষিক্ত কম্বল ও মাদুরের উপর গৃহস্বামী লম্বোদর শয়ন করিয়া কালান্তক বৃশ্চিক-দংশনে ছট্‌ফট্ করিতেছেন! যেন ধনুষ্টঙ্কার উপস্থিত! মধ্যে মধ্যে পরিত্রাহি চীৎকার!

পাঁচ দিন অতীত।—বৃশ্চিক-দংশনের জালা কমিয়াছে, ফুলা কমে নাই; ফটীকচাঁদ আপনার মৌরাসী গৃহে মৌরাসী

শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, বেলা এক প্রহর; সেই সময় একটী দশম বর্ষীয়া বালিকা তাঁহার শয্যার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল। কন্যাটীর নাম শারদা। শারদার পিতা এক দিন পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, "ফটীক! তুমি অতি সুপাত্র; আমার শারুর সহিত তোমার বিবাহ দিব।" ফটীকচাঁদ সেই পরিহাসে পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া ভাবিয়াছিলেন, রাজাদের যেমন অনেক রাণী থাকে, আমারও তেমনি দুই রাণী হইবে।। নবদুর্গা আর শারদা। মনে মনে এই রূপ কল্পনার উদয় হওয়াতে শারদাকে দেখিলেই ফটীকচাঁদ হাস্য করিতেন। শারদা বালিকা, বিবাহের নাম শুনিয়া আহ্লাদ হইতে পারিত, একটু একটু লজ্জাও আসিতে পারিত; কিন্তু বর নিতান্ত কুৎসিত হইবে, সেই দুঃখে বালিকা-হৃদয় সর্ব্বদা যেন নিষ্প্রভ হইয়া থাকিত, মুখখানি মলিন হইয়া যাইত, এক এক বার চক্ষে জল আসিত। আর কেহ নিকটে থাকিলে ফটীকের চেহারার কাছে শারদাকে দেখিয়া বিদ্রুপের হাসি হাসিতে হাসিতে পলাইয়া যাইত। প্রথম দিন তাহাই ঘটিয়াছিল। একটী প্রতিবাসিনী সমবয়স্কা বালিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শারদা যে কলাবাগানের দিকে ছুটিয়া গিয়াছিল, তাহারও কারণ ঐ। এ দেশের বালিকারা সতীনকে বড় ভয় করে। নিতান্ত বালিকা-কালে সেঁজুতীর ব্রতে সতীনের উপর হিংসা করিতে শিক্ষা পায়। শারদাও সে শিক্ষায় বঞ্চিত ছিল না। সে যখন শুনিল, নবদুর্গা তাহার সতীন হইবে, তখন আর ফটীকচাঁদকে দেখিয়া তাহার দুঃখ হইত না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে নিত্যই দেখিতে আসিত, আজ সাত আট দিনের পর আসিয়াছে। ফটীকচাঁদ তাহাকে এক এক

করিয়া আট দশটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; শারদা হেঁট হইয়া বসিয়া রহিল, উত্তর করিল না। অবশেষে "তোমার সহিত আমার বিবাহ হইবে না" বলিয়া শীঘ্রগতি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। বালিকার মনে কি ভাব আসিয়াছিল, বালিকার রসনা কেন ও কথা উচ্চারণ করিল, প্রজাপতিই তাহা জানেন। ফটীকচাঁদ বাবু নবদুর্গার ধ্যান করিতে লাগিলেন; ছেঁড়া মাদুর যেন তাঁহার পক্ষে তখন অনন্ত সুখময় সুখশয্যা বোধ হইতে লাগিল!

তৃতীয় কল্প।

শশিকান্ত ও নবদুর্গা।

শশিকান্তের গৃহে শশিকান্তের সহিত নবদুর্গার সাক্ষাৎ হইয়াছে। বিমর্ষ-বদনে শশিকান্ত বলিতেছেন, "প্রিয়তমে! আমি বোধ করি, স্বর্গের অমৃত আমার অদৃষ্টে ঘটিল না! তোমার পিতার নিতান্ত পণ হইয়াছে, ফটীকচাঁদের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিবেন।"

নবদুর্গা উত্তর করিলেন, "প্রথমে স্বর্গে ত অমৃত ছিল না, সাগরে ছিল, অনেক কষ্টে দেবতারা তাহার অধিকারী হইয়াছিলেন।"

শশিকান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, "ইহাতে আমি কি বুঝিব?"

নবদুর্গা কহিলেন, "বুঝিতে না পারিলে আমিই বা আর কি করিব?" দুই জনেই রোদন করিতে লাগিলেন।

ফটীকচাঁদের রূপগুণের বিষয় প্রথমেই পাঠক মহাশয়কে

বিদিত করা হইয়াছে। নবদুর্গার পিতা তাদৃশ পাত্রের হস্তে পরম রূপবতী প্রাণাধিকা তনয়াকে অর্পণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কেন, এ কৌতূহল অতি সহজে স্বভাবতই জন্মিতে পারে। এক কথায় আমরা তাহার মীমাংসা করিব। নবদুর্গার পিতা প্রাচীন তন্ত্রের লোক, অত্যন্ত ধনলোভী, যথোচিত জ্ঞান শিক্ষার অভাবে নানা প্রকার প্রলোভনের দাস; সহজে সামান্য লোকের নিকটেও অর্থলোভে তিনি বাধিত হইতে পারেন। ফটীকচাঁদ সামান্য গৃহে অতি দীনভাবে অবস্থান করেন বটে, নিদারুণ কাশরোগে তাঁহার কলেবর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে, ইহাও সত্য। কিন্তু ফটীকচাঁদের পিতায় যখন মৃত্যু হয়, তখন তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন, "গৃহের ভিত্তিতে ভিত্তিতে অনেক অলঙ্কার আর নগদ টাকা পোতা আছে, গৃহ ত্যাগ করিও না, সমস্তই তুমি প্রাপ্ত হইবে।" ফটীকচাঁদের পিতা আর নবদুর্গার পিতার মধ্যে নিত্য বৈকালে পাশাখেলার বন্ধুত্ব ছিল। সুতরাং নবদুর্গার পিতা সেই গুপ্ত ধনের বিষয় সমস্তই অবগত ছিলেন। ফটীকচাঁদ সেই ধনের উত্তরাধিকারী। তাঁহাকে কন্যা দান করিতে পারিলে অলঙ্কারগুলি কন্যা পাইবে, আর টাকাগুলি তিনি নিজে পাইবেন। ফটীকচাঁদও স্বয়ং ইহা স্বীকার করিয়াছেন। সেই লোভেই নবদুর্গার পিতা ফটীকচাঁদের প্রতি তত দূর অনুকূল।

শশিকান্তের তাদৃশ অর্থসঙ্গতি ছিল না। এক মাত্র ঈশ্বরের উপাসনায় অনুরক্ত বলিয়া অর্থের প্রতি তাদৃশ আনুরক্তিও ছিল না; সুতরাং পিতার অসম্মতিতে নবদুর্গা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিবেন, ইহাও এক প্রকার অসম্ভব জ্ঞান ছিল।

ইহা ভাবিয়াই শশিকান্ত রোদন করিলেন। শিক্ষার সহিত ধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে, শৈশবাবধি শশিকান্তের প্রতি অকপট অনুরাগ জন্মিয়াছে, পিতার অমতে তাঁহার সহিত বিবাহ হইতে পারে না, এই আশাভঙ্গ-দুঃখেই নবদুর্গা রোদন করিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চারি চক্ষে অশ্রুপ্রবাহের অবিরাম অভিনয় হইল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সুস্থির অনিমেষ নেত্রে দৃষ্টি বিনিময়ে উভয়েই মৌন। অগ্রে কে কি কথা বলিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। প্রায় এক দণ্ড পরে শশিকান্ত একটী নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "নবদুর্গা! অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, তুমি দুর্লভ বস্তু, তোমাকে পাইবার আর আমার আশা নাই। কিন্তু ইহাও বুঝিতে পারিতেছি, তোমার বিবাহের পূর্ব্বে যদি আমি ইহ সংসার পরিত্যাগ না করি, তুমি অপরের হইবে, জীবিত থাকিয়া ইহা যদি আমাকে স্বচক্ষে দেখিতে হয়, তাহা হইলে আমার জীবনের পরিণাম যে কিরূপ দাঁড়াইবে, ঈশ্বরের দোহাই, তাহা ভাবনা করিতে আমার হৃদ্‌কম্প হইতেছে।" এই কথা বলিয়া শশিকান্ত যুগলহস্তে নয়ন ও বদন আবরণ করিলেন।

নিঃশব্দে নেত্র মার্জ্জন করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে নবদুর্গা কহিলেন, "আমি অপরের হইব না। পিতার আকিঞ্চনে নিতান্ত পক্ষে যদি তোমার সহিত আমার মিলন হইবার বাধা ঘটে, তাহা হইলে অপরের হইবার অগ্রেই আমি এই অসার পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইব।"

শশিকান্তের বদনে প্রতিধ্বনি হইল, "আমিও যাইব! একাকিনী যাইও না! পথে কষ্ট হইবে। আমি তোমার

অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া যাইব। পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন স্থানে যদি শান্তিনিকেতন থাকে, আমরা উভয়ে সেই শান্তি-নিবাসে গিয়া সুখময়ী শান্তি-দেবীর সুকোমল ক্রোড়ে অনন্ত-কালের জন্য শয়ন করিয়া অনন্ত সুখ উপভোগ করিব।”

আবার উভয়ের নেত্রে অবিরল প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। স্বর্গীয় পবিত্র প্রেমে উভয়ের হৃদয় যেন পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। আর তাঁহারা এক স্থানে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। অপরাহ্ণ হইতে কথোপকথন আরম্ভ হইয়াছিল, রাত্রি চারি দণ্ড অতীত হইয়া গিয়াছে, অনুভব ছিল না। নবদুর্গা গৃহে গমন করিলেন। শশিকান্ত একটী নিভৃত-কক্ষে শয়ন করিয়া পরমেশ্বরের চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। নবদুর্গাই তখন যেন তাঁহার হৃদয়ে পরমেশ্বরের প্রতিমারূপে আবির্ভূতা হইলেন।

চতুর্থ কল্প।

ফটীকচাঁদ ও নবদুর্গা।

শশিকান্তের সহিত নবদুর্গার সাক্ষাৎ হইবার দুই দিন পরে নবদুর্গার পিতা হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ফটীকচাঁদকে আপন আলয়ে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। বাবু ফটীকচাঁদ শিশু-পালের মত আহ্লাদে আটখানা হইয়া যথাসম্ভব উজ্জ্বল বেশ-ভূষা পরিধানপূর্ব্বক ঠিক সন্ধ্যার পরে নবদুর্গার পিতৃভবনে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ দর্শন দিলেন। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় জানিতেন,

ভদ্রসন্তানের অভ্যর্থনা করিতে হইবে, বৈঠকখানার একটী ঘর সুন্দর সজ্জায় সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। যেখানে নিত্য রেড়ী জ্বলে, আজ রাত্রে সেখানে মৌমাছীর উচ্ছিষ্ট মোমের বাতি প্রতিনিধি। মধ্যস্থলে একখানি জরি মোড়া কার্পেট; তিন পাশে তিনটী মখ্‌মল-ঢাকা তাকিয়া। ফটীকচাঁদ বাবু সেই বরাসনে সুখাসীন হইলেন। একটী সরঞ্জাম অপ্রতুল। ক্ষণে ক্ষণে কাশি আসিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত বিব্রত করে। কাণা ভাঙ্গা মাটীর মাল্‌সাটী ঘরে পড়িয়া রহিয়াছে। দূরবর্ত্তী রূপার পিক্‌দানে দম রাখিতে তাঁহার সাহস হইতেছে না, হরিপদ বাবু ব্যস্তসমস্ত হইয়া ফটীকচাঁদের কাছে আসিয়া বসিলেন। বেশী কথা কহিবার অবসর হইল না, জলখাবার সামগ্রী প্রস্তুত। অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ফটীকচাঁদ বাহির বারাণ্ডা হইতে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আসিলেন। এদিকে লহমে লহমে বেদম, ঘন ঘন হাই; কিন্তু কেন? অপরে তাহা জানে না। হরিপদ বাবু ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া যথোচিত শিষ্টাচারে কহিতে লাগিলেন, "বাপু ফটীকচাঁদ! আজ আমি কেন তোমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছি জান? সে কথা তোমার মনে আছে?"

"কোন্ কথা মহাশয়?" পূর্ব্বস্মৃতি হারাইয়া যেন কিছু অপ্রতিভভাবে দ্বিতীয় প্রশ্নচ্ছলে ফটীকচাঁদ উত্তর করিলেন, "কোন্ কথা মহাশয়?"

লোভের মোহিনী শক্তি। লোভী লোক সে শক্তিকে অধিক ক্ষণ চাপিয়া রাখিতে পারে না। জ্বলন্ত উৎসাহে হরিপদ উত্তর করিলেন, "তোমার পিতার গুপ্ত ধন। যে ধনের বিনিময়ে আমার নবদুর্গা তোমার গৃহলক্ষ্মী হইবেন, সে ধন

যেন—দেখিও, সাবধান—সে ধন যেন পরহস্তে না যায়।"

ফটীকচাঁদ কহিলেন, "এক দিকে আমার জীবন, এক দিকে নবদুর্গা। পিতার গুপ্ত ধন কখনও নবদুর্গা ছাড়া অপরের অধিকারে যাইবে না।"

জোরে একটী ঢোক গিলিয়া হরিপদ কহিলেন, "আচ্ছা বাপু! আর একটী কথা। উপদেশ ত অনেক দিনের, এত দিন তাহা তুমি বাহির কর নাই কেন?"

হাই তুলিয়া ফটীকচাঁদ কহিলেন, "সে অনেক কথার কথা। জানেন ত, বাড়ীখানি জীর্ণ। কোথায় কি আছে, নিশ্চয় জানি না। ভাঙ্গিয়া সমভূমি করিতে হইবে; দাঁড়াইব কোথায়? বিবাহের পর নূতন ইমারত নির্ম্মাণ করাইব। সেই সময়—"

আহ্লাদে হাস্য করিয়া হরিপদ কহিলেন, "বেশ বাপু! এতবুদ্ধি না ধরিলে তুমি আমার জামাতা হইতে পারিতে কি? খুসী হইলাম। নবদুর্গাকে ডাকি; মনের কথা যাহা থাকে, তাহার সাক্ষাতে বল, এক দণ্ড মিষ্টালাপ কর; আমি ততক্ষণ অন্য গৃহে আপনার অন্য কর্ম্ম পর্য্যালোচনা করি।"

কে আসিয়াছে, কিছুই জানা ছিল না, লজ্জাশীলা নবদুর্গা উজ্জ্বল বেশভূষা করিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। ঘরে যেন চন্দ্রোদয় হইল। ফটীকচাঁদ উঠিয়া অভ্যর্থনা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, পেটের ভরে নড়িতে পারিলেন না। বসিয়া বসিয়া অল্প একটু উঁচু হইয়া যুগল হস্ত বিস্তার করিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "আগচ্ছাগচ্ছ কান্তে! এসো আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণশশি! আমি——"

কাশিতে কাশিতে দম আটকাইয়া গেল; তিন চারি মিনিট

আর কথা কহিতে পারিলেন না। একটু সামলাইয়া আবার থামিয়া থামিয়া কহিতে লাগিলেন। নবদুর্গা!—এসো—এসো!—আমার — কাছে — আসিয়া— বোসো!

নবদুর্গা বিরক্ত হইলেন না; মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিলেন! সঙের তামাসা কত দূর চলে, দেখিবার ইচ্ছায় ফটীকের রোমাসনের পাঁচ হাত তফাতে উপবেশন. করিলেন।

ফটীকচাঁদের বিপুল আনন্দ! আনন্দে বিকলাঙ্গেরও সমস্ত অঙ্গ সচল হয়। একটী বালিশে ভর দিয়া নির্নিমেষ নয়নে নবদুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া ফটীক একটু বঙ্কিম ভঙ্গিতে উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন, "নবদুর্গা!" আমার কি সৌভাগ্য! তুমি আমার পত্নী হইবে, আমি তোমার পতি হইব, আহা!. ভাব দেখি, কি চমৎকার সুখ! তা কেন? অলক্ষণ কেন? ভবিষ্যৎ কথাই বা কেন?—হইয়াছে, তুমি আমার হৃদয়রাজ্যের রাণী হইয়াছ, আমি তোমার প্রেমকিঙ্কর হইয়াছি; উভয়েই প্রেমসাগরে ভাসিতেছি; আমাকে দেখিয়া লজ্জা করিতেছ কেন?

কাশি আবার বাধা দিল। নবদুর্গার কর্ণ একটু জুড়াইল। একটু পরে প্রেমিক নাগর আবার ধূয়া ধরিলেন। তোমার—"

অৰ্দ্ধ সমাপ্ত বাক্যটী মুখেই থাকিয়া গেল। খকর্ খকর্ কাশির তুফানে সর্ব্ব শরীরে যেন ভূমিকম্প হইতে লাগিল। নবদুর্গা মাথা হেঁট করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। একটীও কথা কহিলেন না। উপাধানে দম রাখিয়া ফটীকচাঁদ আবার ভূমিকা ধরিলেন, "মহেশ্বরি! আমি তোমার পতি, তুমি আমার রাণী। কথা কও, এক বার মুখ তুলিয়া চাও, প্রসন্ন হইয়া

একবার হাসো। রাতদিন আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখি; রাত দিন তুমি আমার হৃদয়ে জাগ; তুমি অচঞ্চল সৌদামিনী; আমার জীবন যৌবন সমস্তই তোমাকে উৎসর্গ করিয়াছি। একটী বার কথা কও!"

কথা কহিবার ইচ্ছা ছিল না; তথাপি তাচ্ছীল্যভাবে একটু হাস্য করিয়া নবদুর্গা কহিলেন, "সে কথা আমি শুনিয়াছি, আশা মানুষকে রাজা করে, আশা মানুষকে পাগল করে। তুমি আমার আশা পরিত্যাগ কর। বিধাতার ইচ্ছা, আমি তোমার হইতে পারি না। তোমাকে আমি ভাল বাসিতে পারিব না।"

গাত্র সঞ্চালন পূর্ব্বক ফটীকচাঁদ কহিলেন, "অনূঢ়া লজ্জাশীলা বালিকার নবীন প্রেম এই রকমেই অঙ্কুরিত হয় বটে!"

নবদুর্গার নয়নে যেন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। বক্র দৃষ্টিতে ফটীকচাঁদের দিকে চাহিয়া সগর্ব্বে কহিলেন, "রসনাকে দমন করিতে শিক্ষা কর। বিবাহিতা না হইয়াও আমি—"

"বিবাহিতা না হইয়াও তুমি আমার প্রতি সুপ্রসন্ন, ইহাই কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছ?"

সমান তাচ্ছীল্যে নবদুর্গা কহিলেন, "শুন ফটীকচাঁদ! আমার মনের কথা না শুনিয়া নির্লজ্জের ন্যায় তোমার নিজের মনের মত সিদ্ধান্ত করিও না! তুমি অতিথি, তোমার অবমাননা করিতে আমার ইচ্ছা নাই; কিন্তু ঐ প্রকারের বাক্য এই পবিত্র কুমারীর কর্ণে স্থান পাইবে না, এটী তোমার নিশ্চয় জানিয়া রাখা উচিত। যদি আর এক বার তোমার রসনা ঐরূপ ঘৃণাকর বাক্য উচ্চারণ করে, তৎক্ষণাৎ আমি এখান হইতে উঠিয়া যাইব।

চঞ্চলভাবে নবদুর্গার তেজস্বী নয়নে চঞ্চল নয়ন নিক্ষেপ করিয়া ফটীকচাঁদ কহিলেন, "তবে কি তুমি তোমার পিতার অপমান করিতে চাও?"

"না—কখনই না। পিতার অপমান করা পিতৃবৎসলা কুমারীর অভিসম্পাতস্বরূপ। কথা এই, তিনি আমার মনের কথা জানেন না। আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারিব না।"

তীব্রভাবে এই কথা বলিতে বলিতে নবদুর্গা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সড়্ সড়্ করিয়া পূর্ব্বদিকের একটী যবনিকা সরিয়া গেল; দ্রুতপদে হরিপদ প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই আরক্তনয়নে কুমারীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "নবদুর্গা! কি কর! উপবেশন কর। উতলা হইতে নাই। নিমন্ত্রিত অতিথির অবমাননা করিলে পাপ হয়। আমি তোমার পিতা; আমি সম্বন্ধ করিয়াছি, এই ফটীকচাঁদ তোমার পতি হইবে। আমার কথা অমান্য করিয়া তুমি কি স্বেচ্ছাচারিণী হইতে ইচ্ছা কর?"

"না পিতা! আমি স্বেচ্ছাচারিণী হইব না। পিতা! পিতা! ক্ষমা কর, আমি স্বেচ্ছাচারিণী নই।" নবদুর্গার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

"নয় কেন?" উত্তেজিত হইয়া হরিপদ কহিলেন, "নয় কেন? তুমি স্বেচ্ছাচারিণী নও কেন? এই ফটীকচাঁদকে তুমি যেরূপ অপমান করিলে, স্বকর্ণে আমি তাহা শ্রবণ করিয়াছি; কুমারী বালিকার পক্ষে এত দূর অহঙ্কার নিতান্ত অসহ্য।"

কন্যাকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া ফটীকচাঁদের দিকে মুখ ফিরাইয়া হরিপদ বাবু কহিলেন, "বাপু ফটীকচাঁদ! কিছু

মনে করিও না। মেয়ে আমার এক এক সময় ঐ রকম হয়। সে কথা তুমি ভুলিয়া যাও। আসল কথা ভুলিয়া যাইও না। তোমার পিতার গুপ্ত ধনের অধিকারী তুমি। নবদুর্গাই তাহার অধিকারিণী হইবে। সেইটী বুঝাইয়া দিলেই নবদুর্গা শান্ত হইবে, আর দ্বিরুক্তি করিবে না।"

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নবদুর্গা কহিলেন, "পিতা! তোমার কথায় আমার হাসি পায়। সামান্য ধনের লোভে তোমার নবদুর্গা কি ভুলিয়া যাইবে?"

কথায় কথায় হাস্য করিয়া হরিপদ একটী তাকিয়া বুকে দিয়া অর্দ্ধশায়িতভাবে জাজিমের উপর উপবেশন করিলেন। গম্ভীরভাবে কন্যাকে কহিলেন, "বোস, নবদুর্গা, বোস। অন্য ধনের কথা আমি কহিতেছি না, তোমাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলাম কিজন্য জান? মনের মত পতিলাভ করিয়া সুখী হইবে, সেইটী আমার অভিলাষ, সেই আমার আকিঞ্চন। এই ফটীকচাঁদ তোমার উপযুক্ত পাত্র। উত্তমরূপ লেখাপড়া জানেন, ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তি, ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, বিলক্ষণ দশ টাকার সংস্থান আছে, আরও দশ টাকা উপার্জ্জন করেন, মনে মনে মিলিবে, তুমি রাজরাণীর মত সুখী হইতে পারিবে।"

নবদুর্গা কথা কহিলেন না। হরিপদ আবার কহিলেন, "নবদুর্গা! ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ। ফটীকচাঁদে আর শশিকান্তে কত প্রভেদ, এক বার ভাবিয়া দেখ। শশিকান্ত কি? রাতদিন চক্ষু বুজিয়া কেবল আকাশ চিন্তা করে; বিষয়কর্ম্ম কিছুই করে না, একটী পয়সার সংস্থান নাই, অলসের শিরো-

মণি; তাহাকে লইয়া তুমি কি সুখী হইতে পারিবে? ছিঃ! এই জন্য কি আমি তোমাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলাম? ফটীকচাঁদকে বিবাহ কর। আমি সুখী হইব, তুমি সুখী হইবে, পরমেশ্বরও তুষ্ট হইবেন।”

তিন জনেই বিস্তব্ধ। এই সময় পাঠক মহাশয়কে আমরা দুটী ঘরাও কথা শুনাইয়া রাখি। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, নবদুর্গার পিতা হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রাচীন তন্ত্রের লোক। সচরাচর প্রাচীন তন্ত্রের হিন্দুরা যেরূপ দেশাচার-শাস্ত্রের সেবা করেন, হরিপদ সেরূপ ধরণে চলিতে ইচ্ছা করেন না। স্বভাবতঃ অত্যন্ত জঘন্য কৃপণ। ব্রহ্মজ্ঞানী হইলে লোকালয়ে ক্রিয়াকলাপে অর্থব্যয় করিতে হয় না, ইহা দেখিয়া তিনি নব্যব্রাহ্ম দলে মিশিতে সবিশেষ যত্নবান্। মুখে তিনি অদ্বিতীয় ব্রহ্মবাদী। অর্থ উপার্জ্জনে ও অর্থ সঞ্চয়ে তাঁহার তুল্য ফন্দীবাজ লোক অতি প্রাচীন হিন্দুতন্ত্রেও অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। যে পথে, যে মতে অর্থ হস্তগত হইতে পারে, তাহার কিছুতেই তিনি পরাঙ্মুখ নহেন। অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ তখন তাহার প্রতিবাদী হয় না। ভাল মন্দ উভয় উপায়ে টাকাও অনেক সঞ্চয় করিয়াছেন, কিন্তু আশার নিবৃত্তি হয় নাই। তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই একটী সংস্কৃত শ্লোক শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার অর্থ এই, আশা-পারে কে গিয়াছেন? শতপতি সহস্রপতি হইবার কামনা করেন; সহস্রপতি লক্ষপতি হইবার বাসনা রাখেন; লক্ষপতি আবার ক্রোরপতি হইবার ইচ্ছা করেন; ক্রোরপতি ইন্দ্রত্ব চাহেন; ইন্দ্র ব্রহ্মত্ব কামনা করেন; ব্রহ্মা শিবত্ব অভিলাষী; শিব আবার হরিপদ বাঞ্ছা করিয়া থাকেন।

আশা-পারে কে যাইতে পারেন ?

হরিপদ বাবু এই "হরিপদ" পর্য্যন্ত আশাকে হৃদয়ে স্থান দান করেন কি না, সে কথা কে বলিবে ? কিন্তু যে কোন কৌশলে তিনি যে লক্ষপতি হইবার অভিলাষ রাখেন, সেটী অভ্রান্ত নিশ্চয়। যাঁহার প্রকৃতি এইরূপ, তিনি যে অর্থ-লোভে অযোগ্য পাত্রে দুহিতা সম্প্রদানে দৃঢ়সংকল্প হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি ?

ফটীকচাঁদের রূপগুণের পরিচয় এক প্রকার প্রদান করা হইয়াছে, এক্ষণে কেবল একটী কথা বাকি। নবদুর্গাকে প্রবোধ দিয়া হরিপদ বলিয়াছেন, ফটীকচাঁদ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক। কথা সত্য। পল্লীগ্রামের রাজ-সাহায্য-প্রাপ্ত একটী ইংরাজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষকের পদে ফটীকচাঁদ বাবু নিযুক্ত আছেন; মাসিক বেতন পঞ্চদশ মুদ্রা। বলিতে ও শুনিতে পঞ্চদশ যথার্থ, কিন্তু সকল মাসে হাতে পাইতে তত নয়। কোন কোন সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের কার্য্যপ্রণালী-মধ্যে ইংরাজি ধরণের একটী কৌশল আছে। স্থানীয় চাঁদায় ও ছাত্রদত্ত বেতনে বেশী টাকা আদায় হয় না, অথচ বেশী দেখাইয়া সরকার হইতে অর্দ্ধাংশ সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে ; সুতরাং হিসাব ফুলাইয়া মাষ্টার ও পণ্ডিতের বেতনে বেশী অঙ্ক ধরিয়া দিতে হয়। বোধ করুন, প্রথম শিক্ষক পঞ্চাশ টাকা, দ্বিতীয় শিক্ষক চল্লিশ টাকা, তৃতীয় শিক্ষক কুড়ী টাকা, পণ্ডিত আঠার টাকা ; হিসাবে এইরূপ লেখা আছে ; মাসে মাসে তাহারা ঐরূপ অঙ্কেই রসীদ স্বাক্ষর করেন। কিন্তু বাস্তবিক প্রাপ্ত হন কে কি ? কেহ পঞ্চাশের স্থলে ত্রিশ, চল্লিশের স্থলে

পঁচিশ, বিংশতিস্থলে দ্বাদশ, অষ্টাদশস্থলে দশ ইত্যাদি ইত্যাদি। কোন কোন মাসে কিছু কিছু ন্যূনাধিক হইয়া থাকে। আমাদের ফটীকচাঁদ পঞ্চদশে নিযুক্ত, তাঁহার ভাগ্যে কোন মাসে দশ, কোন মাসে একাদশ, ঊর্দ্ধ সংখ্যা কোন মাসে ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত লাভ হয়। এই তাঁহার শিক্ষকতার পুরস্কার।

প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে আসা হইয়াছে। বিবাহের সম্বন্ধ কোথায় গিয়া থামিল, দর্শন করা আবশ্যক। তিন জনেই নিস্তব্ধ ছিলেন। অগ্রে মৌন ভঙ্গ করিয়া হরিপদ কহিলেন, "নবদুর্গা! মা! ভাল করিয়া বিবেচনা কর, ফটীকচাঁদকে বিবাহ করিলে সত্যই তুমি রাজরাণীর মত সুখে থাকিতে পারিবে। বিশেষ, আমার অনুরোধ; ইহাতে অবহেলা করিতে নাই; অবহেলা করিও না।"

নবদুর্গা দাঁড়াইয়া ছিলেন, নতমুখী হইয়া আবার একটু দূরে উপবেশন করিলেন। নতমুখেই মৃদুস্বরে কহিলেন, "পিতা! এই অনুরোধে আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে, তাহা আমি কখনই পারিব না।"

ফটীকচাঁদ একটু উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "নবদুর্গা! আমি জানিতাম, তুমি বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছ, তোমার ধর্ম্ম-জ্ঞান আছে, ভালমন্দ বিবেচনাকে হৃদয়ে স্থান দিতে জান; কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহা আমার ভুল। আমি তোমাকে দিবারাত্রি মানসমন্দিরে পূজা করি, তুমি আমার নিত্য আরাধ্য দেবতা, তুমি আমাকে অগ্রাহ্য করিলে আমি আত্মঘাতী হইয়া মরিব, সে পাপ কাহার হইবে? তাহা কি তুমি একবারও

ভাবিতেছ না? বুঝিলাম, শশিকান্তকে ত্যাগ করা তোমার ইচ্ছা নয়, তেমনি তোমার আশা পরিত্যাগ করাও আমার পক্ষে অসাধ্য। এমন সঙ্কটস্থলে কাহার কি উপায় হয় বল দেখি!"

কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই নবদুর্গা ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "ফটীকচাঁদ! ক্ষান্ত হও, ক্ষমা কর! তোমার বৃথা চাটুবাক্য আর আমি শ্রবণ করিতে পারি না। আরও দুই তিন বার তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনবারই আমি তোমাকে বলিয়াছি, কোন উপরোধেই আমি তোমার হইতে পারিব না; তথাচ তুমি আমাকে চিনিতে পারিলে না? তথাপি তুমি আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিলে না? এখনও—"

বাধা দিয়া হরিপদ কিঞ্চিৎ উগ্র স্বরে কহিলেন, "নবদুর্গা! বার বার তুমি আমার কথায় অনাদর করিতেছ, ফটীকচাঁদ যত কথা কহিতেছেন, তাচ্ছল্যভাবে সমস্তই কাটাইয়া দিতেছ, এটী কিন্তু তোমার মত সুশীলা ধর্ম্মশীলা কুমারীর উপযুক্ত কার্য্য হইতেছে না। আমি আরও একটী কথা বলি। তুমি শশিকান্তের প্রতি একান্ত অনুরাগিণী, কিন্তু শশিকান্ত যদি তোমাকে গ্রহণ করিতে না চায়, তাহা হইলে তুমি ফটীকচাঁদকে বরণ করিতে সম্মত হইবে কি না!"

নবদুর্গা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মাধুর্য্যভাবে সজলনয়নে পিতার বদন নিরীক্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎ স্তম্ভিতস্বরে কহিলেন, "পিতা! এ কথার উত্তর আমি এখন দিতে পারিতেছি না। আমার কেমন অসুখ করিতেছে। বিবেচনা করিয়া আর এক

সময়ে আপনাকে আমার মনের কথা জানাইব। এখন আমি চলিলাম।” সংক্ষেপে এই কটী কথা বলিয়া নবদুর্গা ধীরে ধীরে সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ফটীকচাঁদের বদন যেন মেঘাচ্ছন্ন হইল। ঘন ঘন হাই তুলিয়া তিনি জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। ভাব বুঝিতে পারিয়া হরিপদ কহিলেন, “ফটীকচাঁদ! অত বিষণ্ণ হও কেন? হতাশ হও কেন? আমি রাজি করিব। বালিকা, মন একটু চঞ্চল হইয়াছে, ভুলাইয়া দিতে কতক্ষণ? শশিকান্ত যাহাতে আমার ভদ্রাসনের ত্রিসীমায় আসিতে না পারে, আমি বিধিমত প্রকারে তাহার চেষ্টা করিব। নবদুর্গাকে আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কখনই তাহা লঙ্ঘন হইবে না।”

ফটীকচাঁদ একটু আশ্বস্ত হইলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছিল, সে রাত্রি তাঁহাকে আপন বাটীতে রাখিবার জন্য হরিপদ বিস্তর অনুরোধ করিলেন, কিন্তু রাখিতে পারিলেন না। কাহার সাধ্য, ফটীকচাঁদের মত লোককে মৌতাতের সময় কোন স্থানে আটকাইয়া রাখে! ঘন ঘন হাই উঠিতেছিল, পেট ফুলিয়া প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা, সুতরাং ফটীকচাঁদ কোন অনুরোধ শুনিলেন না। কোন বাধা মানিলেন না, হরিপদ অগত্যা এক জন লোক সঙ্গে দিলেন, প্রায় অর্দ্ধ রাত্রি সময়ে ঘোর মৌতাতী ফটীকচাঁদ আপনার মৌতাতগৃহে উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চম কল্প।

প্রবালকুঞ্জ।—প্রণয়ী দর্শন।

ময়ূরাক্ষী নদীর পর পারে একটী মনোহর উদ্যান আছে। কোন কার্য্যগতিকে শশিকান্ত তৎকালে সেই উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। নবদুর্গা তাহা জানিতেন। এক দিন নিশাকালে তিনি একাকিনী পুরুষবেশে সেই উদ্যানে গমন করিলেন। সময়ে সময়ে মানুষের প্রতি ময়ূরাক্ষীর বড় অনুগ্রহ, সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া নরনারীর গমনাগমনের পথ প্রস্তুত করিয়া দেন। বহুদূর পর্য্যন্ত কেবল কঙ্করময় বালী ধূ ধূ করে। নৌকা অথবা অন্য কোন প্রকার জলযানের প্রয়োজন করে না। নবদুর্গা সেইরূপ শুভ অবসরেই ময়ূরাক্ষী পার হইয়াছিলেন। পূর্ব্বদিকে কেবল কিঞ্চিন্মাত্র মেঘ সঞ্চার ছিল। উদ্যানে প্রবেশ করিয়া নবদুর্গা সেই ছদ্মবেশেই শশিকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বেশ ছদ্ম বটে, কিন্তু প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখিলেন না।

শশিকান্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি! তুমি এ বেশে এখানে কি নিমিত্ত উপস্থিত?" নবদুর্গা উত্তর করিলেন, "যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ করিতে আসিয়াছি; জন্মশোধ প্রতিজ্ঞাপূরণ!"

শশিকান্তের বদন প্রফুল্ল হইল। তিনি তখনকার প্রকৃত সমাচার কিছুই জানিতেন না। নবদুর্গা প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করিতে আসিয়াছেন, এ বাক্যে তাঁহার অন্তঃকরণ অবশ্যই আনন্দে

নৃত্য করিতে পারে। কিন্তু যখন শুনিলেন, জন্মশোধ প্রতিজ্ঞা পূরণ, তখন হৃদয়মধ্যে আর এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল।

নবদুর্গা কিয়ৎক্ষণ মুহূর্ত্তকাল সেইরূপ নিশ্চলভাবে নীরবে থাকিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে ধীরে ধীরে কহিলেন, "শশি! আমার জীবনের অবসান হইল। তুমি সংসারে সুখী হইয়া পরমেশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিও। আমি অবলা, আমি বাঁচিয়া থাকিলে জগতে কাহারও কোন উপকারে আসিতাম না। তুমি বাঁচিয়া থাকিলে জগতের অনেক উপকার সাধন করিতে পারিবে। পিতা সেই ফটীকচাঁদের সহিত আমার পরিণয়সম্বন্ধ অবধারণ করিয়াছেন। আগামী বৈশাখের পঞ্চম রজনীতে বিবাহের দিন স্থির, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না। আমি পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যদি অপরের হইতে হয়, সে দিন আগত হইবার অগ্রেই ইহলোক হইতে প্রস্থান করিব। এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করিবার শুভ অবসর। অদৃষ্টে ছিল এইরূপেই আমার জীবনান্ত হইবে; অদৃষ্টে ছিল, তোমার সহিত আমার মিলন হইবে না। এখন সেই অদৃষ্টকেই সাক্ষী করিয়া তোমাকে সম্মুখে দেখিয়া সেই পরম পিতার শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে আমি জন্মশোধ ছেলেখেলা ভুলিয়া যাই! জন্মশোধ ধরণীসতীর ক্রোড় হইতে বিদায় হই! জন্মশোধ তোমার পবিত্র প্রণয়ের পরিশোধ করি! তুমি আমার জন্য কাতর হইও না। মনোমত দার পরিগ্রহ করিয়া সুখী হইও। আমি বিদায় হইলাম।"

শশিকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "না নবদুর্গা

তুমি বিদায় হইলে শশিকান্ত কদাচ পৃথিবীতে থাকিবে না। তুমি থাক, তোমার অদৃষ্টে অনেক সুখ থাকিতে পারে। তোমাকে প্রাপ্ত হইলে এই মঙ্গলময়ী সংস্পর্শে ফটীকচাঁদেরও শুভাদৃষ্ট ঘটিতে পারে। তুমি থাক, তোমাকে সম্মুখে রাখিয়া আমিই অগ্রে বিদায় হই।" নবদুর্গার চক্ষে আর জল নাই। অটলভাবে পুরুষবেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রেমময়ী নবদুর্গা যেন তেজস্বিনী নবদুর্গা সাজিলেন। তাঁহার প্রফুল্ল নয়নপদ্ম হইতে যেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। বিস্ফারিত লোচনে শশিকান্তের মুখের দিকে চাহিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "আমি থাকিব না। তুমি ফটীকচাঁদকে এক বার সম্বাদ কর। অকারণে আমার প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মিয়াছে। আমি তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছি। মৃত্যুকালে এক বার দেখা করিয়া ক্ষমা চাহিয়া যাইব। কাহাকেও প্রতারণা করিয়া পরমেশ্বরের নিকট অপরাধিনী হইব না। তুমি ফটীক-চাঁদকে সম্বাদ কর।"

শশিকান্ত দেখিলেন, বিষম বিভ্রাট। অনেক নিবারণ করিলেন, কিছুতেই নবদুর্গাকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। নবদুর্গা বরং আরও অধিক আগ্রহে প্রতিজ্ঞারূঢ়া হইয়া, হতাশের হাসি হাসিয়া, বিশুষ্ক সমুজ্জ্বল নয়নে শশিকান্তের নয়ন নিরীক্ষণ করিলেন। উদাসভাবে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "শশিকান্ত! তুমি কি কিছু দেখিতে পাও? এই দেখ, আমার হৃদয়ে আগুন জ্বলিতেছে। হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করিতে আসিয়াছি। তুমি জান, আমার প্রতিজ্ঞা অচল শিখরের ন্যায় অচল অটল [illegible] কাল জীবন

হতাশ হইয়া আমি এখানে মরিতে আসি নাই। আরও কিছু অভিলাষ আছে। একটু কিছু উপায় থাকিতে সহজে আমি স্ব-ইচ্ছায় জীবন পরিত্যাগ করিয়া আত্মাকে কলুষিত করিব না। তুমি এক কর্ম্ম কর; ফটীকচাঁদকে এক বার সংবাদ দাও। তিনি ত আমার জন্য এক প্রকার পাগল হইয়াছেন। এক বার তাঁহাকে এই খানে আনাও। দেখি দেখি, কোনরূপে বুঝাইয়া যদি তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারি। যে উপায়ে হয়, আমি তাঁহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা পাইব। একান্ত অসাধ্য হইলে তখন আর এক উপায় আছে। তাহা তোমায় এখন বলিব না। তুমি এক বার তাঁহাকে সংবাদ দাও।"

শশিকান্ত অনেক তর্ক বিতর্ক করিলেন, কোন ফল হইল না। অবশেষে এক খানি পত্র লিখিয়া ফটীকচাঁদের নিকট লোক পাঠানই স্থির হইল। নবদুর্গা স্বহস্তেই পত্র লিখিলেন; পত্রে এইরূপ লেখা হইল—

"ক্ষেমাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু ফটীকচাঁদ অধিকারী ক্ষেমাস্পদেষু। বন্ধুবর!

মনের চঞ্চলতায় আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছে। আমি এক্ষণে নদী পারের একটী উদ্যানে অবস্থান করিতেছি। এ সময় যদি দেখা করিবার ইচ্ছা থাকে, দয়া করিয়া এক বার আসিয়া দর্শন দিবেন। আমার ঠিকানা পত্রবাহক কহিবে।

শ্রীমতী নবদুর্গা।"

পত্র লইয়া লোক চলিয়া গেল। যথা সময়ে ফটীকচাঁদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। পত্র পাঠ করিয়া আনন্দে ফটীকচাঁদের সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত। হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না।

ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া দুই তিন জন অনুগত লোক সঙ্গে লইয়া বাবু ফটীকচাঁদ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। সম্বলের মধ্যে উত্তরীয় গাত্রমার্জ্জনীর এক কোণে আফিঙের কৌটাটী বাঁধা। ইষ্টক পতনে সাবেক কৌটাটী চূর্ণ হইয়াছিল, এটী নূতন হইয়াছে। পত্র পাঠ করিয়া তত যে আনন্দ, পথে বাহির হইয়া সে আনন্দটুকু এক মহা দুর্ভাবনায় ঢাকা পড়িয়া গেল। একটী বৃক্ষতলে বসিয়া মনের দুঃখে এক মৌতাত চড়াইয়া প্রেমিক ফটীকচাঁদ মনে মনে ভাবিলেন, নবদুর্গার মন চঞ্চল, শরীর অসুস্থ, বড় শক্ত পীড়া; যদি না বাঁচে, তবে আমার দশা কি হইবে? আমি অনেক প্রকার চিকিৎসা জানি, মুষ্টিযোগ আমার অনেক প্রকার আইসে, আমি নবদুর্গাকে আরাম করিব। নবদুর্গা যখন স্বহস্তে আমাকে চিঠি লিখিয়াছে, তখন অবশ্যই তাহার মন ফিরিয়াছে, অবশ্যই আমাকে ভালবাসিয়াছে, আমি উপস্থিত হইলেই আরাম হইতে পারিবে, ইহাও অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছে। আমি অবশ্যই আমার প্রাণপ্রিয়তমাকে আরাম করিয়া তুলিব।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অনুগামী লোকদিগের সঙ্গে পদব্রজে ময়ূরাক্ষী পার হইয়া ফটীকচাঁদ ঠিক সন্ধ্যাকালে সেই নির্দ্দিষ্ট উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। তখনও আকাশে অল্প অল্প মেঘ। পূর্ব্বদিকে ছিল, উত্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ফটীকচাঁদ উপস্থিত হইয়াই দেখেন, শশিকান্ত সম্মুখে। ক্রোধে, হতাশে, ও ঈর্ষায় ফটীকের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, নবদুর্গাকে দেখিতে পাইলেন না।

সায়ংকালে একটী সঙ্গীতের আলাপে শশিকান্ত এক মনে

ঈশ্বরের উপাসনা সমাপ্ত করিতেছিলেন। গীতটী দ্বিভাব-বোধক ছিল। কিয়দংশ দর্শন করিলেই পাঠক মহাশয় তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। তাহা এই—

"জগতে আর কিছু নাই। (ভাই)
বড় সাধ মনে,
হৃদয় রতনে,
হৃদয়ে রাখিয়ে জীবন জুড়াই।"

* * * * *

গীত শুনিয়া ফটীকচাঁদের আরও ঈর্ষা বাড়িল। মুখের ভাবে শশিকান্ত তাহা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে একটু হাসিয়া প্রিয় সম্ভাষণে তাঁহাকে কহিলেন, "ফটীক! ভাই! ভাল আছ ?"

ফটীক তাচ্ছীল্যভাবে এক বার মাথা নাড়িলেন মাত্র; কথা কহিয়া উত্তর করিলেন না। শশিকান্ত একখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া ছিলেন, গাত্রোত্থান করিয়া সহাস্য বদনে কহিলেন, "ফটীকচাঁদ! এই খানে বসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কর; আমি আসিতেছি।" ফটীকচাঁদের মনের ভাব তখন যেরূপ, বুঝিতেই পারা যায়; নিতান্ত অনিচ্ছায় বিষণ্ণ বদনে বেঞ্চের এক ধারে উপবেশন করিলেন। সঙ্গী লোকেরা অদূরস্থিত আর একখানি আসনে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। ফটীকচাঁদ আর কোন দিকে চাহিলেন না; গম্ভীর বদনে নতমস্তক হইয়া ধরাতল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

উদ্যানের বাটীখানি বিলক্ষণ প্রশস্ত। সারি সারি অনেক-গুলি ঘর। পশ্চিম দিকে সদর; পশ্চাতে পূর্ব্ব দিকে অন্দর। অন্দরের একটী কক্ষে অন্যমনস্কভাবে শয়ন করিয়া নবতর্গা

একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। পার্শ্বে দীপাধারে গিল্‌টির সামাদানে একটী মোমবাতি জ্বলিতেছিল। শশিকান্ত গিয়া উপস্থিত হইলেন। নবদুর্গা এত অন্যমনস্ক যে, গৃহে মানবসঞ্চার, প্রথমে জানিতেই পারিলেন না। শশিকান্ত ধীরে ধীরে শয্যার সমীপবর্ত্তী হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "নবদুর্গা! ফটীকচাঁদ আসিয়াছে।"

সহসা চমকিত হইয়া সলজ্জভাবে নবদুর্গা একটু হাসিয়া বলিলেন, "কোথায়? তুমি এত নিঃশব্দে এখানে কিরূপে আসিলে?" তাড়াতাড়ি এই দুটী প্রশ্নের সঙ্গে প্রশ্নকারিণী শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন।

পরিহাসচ্ছলে শশিকান্ত কহিলেন, "প্রশ্নের এমন মিল আর কোথাও আমি কাহারও মুখে শ্রবণ করি নাই!"

নবদুর্গা একটু হাসিলেন। হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "সত্য সত্য উত্তর পাইবার জন্য ও কথা আমি বলি নাই; মনের খেলা আপনা আপনিই প্রকাশ পাইয়াছিল। সত্যই কি ফটীকচাঁদ আসিয়াছে?"

"ইহাতে আর মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন কি? এই একটু পূর্ব্বেই আসিয়াছে।"

"একাকী?"

"না।—তিন জন লোক সঙ্গে আছে।"

নবদুর্গা একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তবে ত সেখানে আমার যাওয়া হয় না। তুমি তাহাকে এই খানে সঙ্গে করিয়া আন। কিন্তু যখন আমি তাহার সঙ্গে কথা কহিব, তখন তুমি এখানে থাকিতে পাইবে না। থাকাতে দুই দোষ।

আমি হয় ত মনের কথাগুলি সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিব না। আর তোমাকে নিকটে দেখিলে ফটীকচাঁদ এককালে জ্বলিয়া যাইবে, ইহা ত ধরাই আছে। তাহাকে এখানে রাখিয়া তুমি চলিয়া যাইও।"

স্বীকার করিয়া শশিকান্ত বাহিরে গেলেন, একটু পরেই ফটীকচাঁদের সহিত শশিকান্তের পুনঃপ্রবেশ হইল। পূর্ব্ব পরামর্শমতে ফটীকচাঁদকে সেই গৃহে রাখিয়া শশিকান্ত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অঙ্গুলি সংকেতে সম্মুখের একখানি আসন দেখাইয়া দিয়া নবদুর্গা মৃদুস্বরে কহিলেন, "ফটীকচাঁদ! বোসো।"

ফটীকচাঁদ সেই আসনের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। নবদুর্গা কি বলেন, শুনিবার জন্য নবদুর্গার প্রশান্ত মুখপানে চাহিয়া আগ্রহে আগ্রহে উৎকর্ণ হইলেন।

ষষ্ঠ কল্প।

ঔষধ ব্যবস্থা।

প্রায় আট দশ মুহূর্ত্ত নবদুর্গা নীরব। শেষে একটী নিশ্বাস ফেলিয়া অতি ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "ফটীকচাঁদ! আমার বড় অসুখ! শরীর যেমন অবসন্ন, মনও তেমনি চঞ্চল।"

"তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি: তাহা আমি দেখিতেই পাইতেছি। আমার মন তোমাকে সমর্পণ করিয়াছি কি না, অষ্ট প্রহর মনের ছায়া মনেই পড়ে। যেই মাত্র আমি তোমার কোমল

করপল্লব নিঃসৃত লিপিখানি প্রাপ্ত হইয়াছি, অমনি তৎক্ষণাৎ —এই দেখিতেছ না, যে বেশে ছিলাম, সেই বেশেই এই গামছা লোহুট করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছি। তুমি জানই ত, আমার পিতা এক জন সুচিকিৎসক ছিলেন; তাঁহার কাছে আমি সর্ব্ব প্রকার ঔষধ শিখিয়া রাখিয়াছি। বল এখন, তোমার জন্য কি ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে?"

"স্থির হও!" অলক্ষিতে মুখ ফিরাইয়া টিপি টিপি একটু হাসা করিয়া নবদুর্গা কহিলেন, "স্থির হয়! একটু বিশ্রাম কর। ঔষধের ব্যবস্থার কথা সমস্তই আমি ভাঙ্গিয়া বলিতেছি। জানি আমি তুমি উত্তম চিকিৎসা জান, সেই জন্যেই তোমাকে সংবাদ দেওয়া। তুমি ভিন্ন অপরের ঔষধে এ রোগ আরাম হইবার নয়।"

ফটীকচাঁদের মুখ গম্ভীর হইল। সুভাষিণীর মুখ হইতে কি ঔষধের নাম বাহির হয়, সাগ্রহ উৎসাহে শ্রবণ করিবার প্রতীক্ষা।

ক্ষণকাল উভয়েই নীরব। হঠাৎ ফটীকচাঁদের একটী হাই উঠিল। একটীর পর একটী, তার পর আর একটী; উপর্য্যুপরি তিনটী বড় বড় হাই। আনন্দে, উৎসাহে, চিন্তায়, আসল কর্ম্মটী তিনি এতক্ষণ ভুলিয়া ছিলেন; সেই ভ্রান্তিদোষে এই উপসর্গ! আড় চক্ষে এক বার চাহিয়া দেখিলেন, নবদুর্গা নতমুখী, যেন কোন ভাবনায় অন্যমনস্ক। অবসরটী ভাল। পাশের দিকে একটু সরিয়া বসিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া উত্তরীয়বদ্ধ নূতন কৌটাটীর গর্ভামৃতের প্রতি দস্তুর মত সুবিচার করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই হাই বন্ধ হইয়া গেল, মৌতাত

চড়িয়া উঠিল। এতক্ষণ কাশি ছিল না, মৌতাতের ঝোঁকে দুই তিন দম কাশিয়া গলাটি শাণাইয়া লইলেন। নবদুর্গা'র কথা কহিবার অগ্রেই মৌতাতী প্রেমিক উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুলোচনে! ব্যবস্থা কি ঠিক হইয়াছে?"

নবদুর্গা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার মুখখানি তখন ঈষৎ লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। নয়ন যুগল হইতে একটু পূর্ব্বে যেন বিন্দু বিন্দু অশ্রুপাত হইয়াছিল, লক্ষণে যেন সেই ভাব সুপ্রকাশ। ফটীকচাঁদের প্রশ্ন শ্রবণবিবরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তথাপি এক দৃষ্টে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া আছেন।

ফটীকচাঁদ ভাবিলেন, তাঁহার কথা হয় ত নবদুর্গার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। এই ভাবিয়া তিনি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "ব্যবস্থা কি ঠিক হইয়াছে?".

উত্তর নাই। নবদুর্গা পূর্ব্বের ন্যায় নীরব। ফটীকচাঁদ ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া তৃতীয়বার সেই প্রশ্নের পুনরুক্তি করিলেন, "ব্যবস্থা কি ঠিক হইয়াছে?"

"হইয়াছে।" অনেকক্ষণের পর মৌন ভঙ্গ করিয়া বিস্ফারিত নেত্রে ফটীকচাঁদের নেত্রপুট নিরীক্ষণ করিয়া নবদুর্গা গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "হইয়াছে। মনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া জানিয়াছি, এ রোগের কেবল একটী মাত্র ঔষধ আছে; আর সেই ঔষধ কেবল তুমিই জান। আমার—"

শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার অপেক্ষা করিতে না পারিয়া প্রেমানন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া ফটীকচাঁদ পূর্ণ মৌতাতের প্রতাপে দম্ভস্বরে কহিলেন, "সে ঔষধ কেবল আমিই জানি?"

নবদুর্গা পূর্ব্ববৎ স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, "হাঁ, সে ঔষধ কেবল তুমিই জান।"

"অনুমতি কর।" আহ্লাদে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপাইয়া ফটীকচাঁদ কহিলেন, "তবে অনুমতি কর। নবদুর্গা! তোমার জন্য আমি সব করিতে পারি। জলে ডুবিতে বল, আগুনে পুড়িতে বল, বাতাসে উড়িয়া যাইতে বল, তোমার জন্য কিছুতেই আমি ভয় করি না। লজ্জাশীলে! লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া অনুমতি কর, কি ঔষধ স্থির করিয়াছ।"

ধীরে ধীরে দু'টি নিশ্বাস ফেলিয়া নবদুর্গা কহিলেন, "ফটীকচাঁদ! তুমি আমার আশা পরিত্যাগ কর।"

এক কালে স্বর্গ হইতে পাতালে অধঃপতন! প্রেমোন্মত্ত প্রেমিকের উৎসাহ-রঞ্জিত প্রফুল্ল বদন সহসা নির্ঘাত-বাক্যে এককালীন বিশুষ্ক হইয়া গেল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। তিন দিকে অবলম্বন না থাকিলে হতাশ প্রেমিক হয় ত ভূতলে পড়িয়া যাইতেন। আসনের রক্ষা-দণ্ড ছিল বলিয়াই রক্ষা হইল।

শশিকান্ত গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, কিন্তু কক্ষান্তরে প্রবেশ করেন নাই। ফটীকচাঁদের সহিত নবদুর্গার কিরূপ কথাবার্ত্তা হয়, গোপনে থাকিয়া উপকর্ণন করিবার বাসনায় কিঞ্চিৎ অন্তরালে অদূরেই অবস্থান করিতেছিলেন। শুনিলেন, নবদুর্গা বলিলেন, "ফটীকচাঁদ! তুমি আমার আশা পরিত্যাগ কর!" আকস্মিক পুলকে শশিকান্তের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিল। তথাপি প্রেমিকের মন কত চঞ্চল, সন্দিগ্ধ প্রেমিকেরা তাহা ভাল জানেন। শশিকান্ত তখনও সন্দেহদোলায় দুলিতে লাগিলেন।

ফটীকচাঁদকে সম্বোধন করিয়া নবদুর্গা পুনরায় কহিলেন, "ফটীকচাঁদ! মনকে দৃঢ় কর; ঈর্ষা অথবা কাতরতাকে হৃদয়ে স্থান দিও না। আমি যদি তোমার কাছে কোন দিন কোন অপরাধ করিয়া থাকি, ক্ষমা কর। আমি তোমাকে ভাল-বাসিতে পারিব না। নারীজাতি স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধি হইলেও ভালমন্দ বিবেচনা করিতে পারে। আমি যে তোমাকে মন্দ বলিয়া উপেক্ষা করিতেছি, এমন কখন ভাবিও না। তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে শশিকান্ত আমার হৃদয় হরণ করিয়াছে। আমার হৃদয় আর এখন আমার নয়, সুতরাং আমিও আর আমার নই এই মনে করিয়া তুমি আমায় ভুলিয়া যাও। অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, কোন মতেই আমি তোমার হইতে পারিব না।"

"তবে আমিও প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না!" অশ্রুসিক্ত বদনে দণ্ডায়মান হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ফটীকচাঁদ কহিলেন, "তবে আমিও প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না!"

"উতলা হইও না ফটীকচাঁদ! অত উতলা হইও না। উপবেশন কর। একটী স্ত্রীলোকের জন্য প্রাণ ধারণ করিতে পারিবে না, এমন কথা বলিতে নাই। পুরুষ পরেশ, তোমার ভাবনা কি? দেশে অনেক সুন্দরী কন্যা আছে, আমি চেষ্টা করিয়া তোমার বিবাহ দিয়া দিব। অর্থ প্রয়োজন হয়, তাহাও আমি দিব তুমি আমার আশা পরিত্যাগ কর। আমি অপরের; আমার জন্য বৃথা আশ্বাসে থাকিয়া বৃথা বৃথা আত্মাকে ক্লেশ দিও না।"

"তবে এত দিন এ কথা বল নাই কেন? তুমিইত আমাকে

আশ্বাস দিয়া রাখিতেছ। তুমি ভিন্ন স্বর্গবিদ্যাধরী আসিলেও আমি তাহার পানে ফিরিয়াও চাহিব না।"

"এ তোমার অন্যায় পণ। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে এক জনের সঙ্গে বিবাহ হওয়া অসম্ভব হইলে আর যে বিবাহ করিব না বলা, এ সৃষ্টিছাড়া কথা। আর, তুমি যে বলিলে, আমিই তোমাকে আশ্বাস দিয়া রাখিতেছি, ইহাই বা কিরূপে বুঝিয়াছ? যে দিন তুমি আমাকে তোমার গৃহে আমন্ত্রণ করিয়াছিলে, আমি যাই নাই, তাহাতেও কি তুমি আমার মনের ভাব বুঝিতে পার নাই? যে দিন আমার পিতা তোমাকে আমাদের বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সে দিন আমি তোমাকে স্পষ্ট স্পষ্ট বলিয়াছি, আমার সহিত তোমার বিবাহ হইতে পারিবে না। তাহাতেও কি তুমি আমার মনের ভাব জানিতে পার নাই? তথাপি তুমি বলিতেছ, আমিই তোমাকে আশ্বাস দিয়া রাখিতেছি। ঐ সকল স্পষ্ট কথাতেও কি আশ্বাস বুঝায়? স্থির হও, এখনও বুঝাইয়া বলিতেছি, উতলা হইও না। আমি শুনিয়াছি, শারদাসুন্দরীর সহিত তোমার বিবাহের কথা হইয়াছে; তাহাকেই বিবাহ কর। আমার এই অলঙ্কারগুলি তোমার শারদাসুন্দরীর জন্য, আরও প্রয়োজন হইলে আরও দিব। আমাকে প্রাণে মারিও না। আমি বাঁচিয়া থাকিলে —"

"অত কথা আমি বুঝিতে পারি না।" একে একে নবদুর্গার প্রদত্ত অলঙ্কারগুলি তুলিয়া আপন উত্তরীয় গাত্র মার্জ্জনীতে দৃঢ় বন্ধনপূর্ব্বক কথায় বাধা দিয়া কিছু রুক্ষ স্বরে কটীকচাঁদ কহিলেন, "অত কথা আমি বুঝিতে পারি না। আমার একটী স্থূল কথা এই যে, তুমি বাম হইলে আর কাহাকেও

আমি বিবাহ করিব না। তোমার পায়ে মাথা কুটিয়া রক্তগঙ্গা হইয়া মরিব।"

"দেখ ফটীকচাঁদ! তুমি যদি অমন কর, তাহা হইলে তোমার জন্য আমাকে দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। এমন দেশে পলায়ন করিব যে, তুমি তাহার সন্ধানও পাইবে না। আমি দেশে থাকিলে তিন জনেরই শান্তি নাশ। আমাদিগের শান্তি নষ্ট করিবার জন্য তুমি অহরহ কুচেষ্টায় ফিরিবে; তোমারও শান্তি অদগ্ধ থাকিবে না। শুদ্ধ তোমার মঙ্গলের জন্যই আমাকে পলায়ন করিতে হইবে। এখনও বলিতেছি, আমি স্বয়ং যত্নবতী হইয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিব, বিবাহের খরচপত্র সমস্তই দিব, তুমি বিবাহ করিয়া সংসারী হও; সুখী হইতে পারিবে। নতুবা আমার দেশত্যাগ অনিবার্য্য।"

"ওঃ! এতক্ষণে তোমার মনের কথা পাইলাম! এই জন্যই তুমি বেয়ারামের ছলে গৃহত্যাগ করিয়া এই বাগানে লুকাইয়া রহিয়াছ! শশিকান্তকে লইয়া দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করাই তোমার মানসিক সংকল্প! রোসো; এই রাত্রেই আমি তোমার পিতাকে সংবাদ পাঠাইয়া তোমাদের দুষ্ট কৌশল ভাঙ্গিয়া দিতেছি! মনেও ঠাঁই দিও না যে, ফটীকচাঁদ বাঁচিয়া থাকিতে তুমি স্বেচ্ছাচারিণী হইতে পারিবে! কখনই আমি তোমাকে পলায়ন করিতে দিব না। এখনি আমি তোমাদের পথ রোধ করিব। এখনি আমি তোমার পিতার কাছে লোক পাঠাইব। দুষ্ট শশিকান্ত তোমাকে চুরি করিয়া লইয়া পলাইতেছে, পুলিষেও এ সংবাদ এজেহার করিব।"

সক্রোধে সদর্পে এই কথা বলিতে বলিতে ফটীকচাঁদ অত্যন্ত

দ্রুতবেগে সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। শশিকান্ত প্রচ্ছন্নভাবে অন্তরালে অবস্থিত ছিলেন; শশব্যস্তে সাঁ করিয়া পার্শ্বের একটী শূন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। ফটীকচাঁদ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। মৌতাতের প্রভাবে চক্ষু ঝিমাইতেছিল, বক্ষঃস্থল দূর দূর করিয়া লাফাইতেছিল, মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়া সাগরতরঙ্গের ন্যায় তরঙ্গিত হইতেছিল, দ্রুতপদবিক্ষেপে বাহির মহলে উপস্থিত হইলেন। সচরাচর তাদৃশ লোকের যেরূপ স্বভাব হয়, তদনুসারে অনেক প্রকার অলঙ্কার পরাইয়া, অনেক প্রকার পল্লব সাজাইয়া, অমূলক স্থূল কথাটী প্রকাণ্ড আয়তনে, উত্তেজিত ফটীকচাঁদ তাঁহার এক জন লোকের দ্বারা নবদুর্গার পিতার নিকট প্রেরণ করিলেন। কথাগুলি মুখস্থ করিয়া তাহার উপর আরও কিছু আদালতী সাজ চড়াইয়া সেই লোক ময়ূরাক্ষী পারে চলিয়া গেল। সদর দরজার ঘাঁটী আগলাইয়া ফটীকচাঁদ বসিয়া রহিলেন। তাঁহার আর দুই জন সহচর সতর্কভাবে ইতস্ততঃ পাহারা দিতে লাগিল। এই অবসরে ফটীকচাঁদ সেই প্রিয় কৌটা খুলিয়া আর একটী দীর্ঘ মৌতাত চড়াইলেন।

রাত্রি ক্রমশই অগ্রসর। শশিকান্ত গুপ্ত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া ফটীকচাঁদের কার্য্যকলাপ সমস্তই দর্শন করিলেন; কিন্তু দেখা দিলেন না। দ্রুতপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "নবদুর্গা! লোকটা যাহা বলিল, তাহাই করিল। আমি সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি। তুমি যাহা বলিলে, সে যাহা বলিল, তাহার পর বাহিরে যে যে কথা হইল, সমস্তই আমি শ্রবণ করিয়াছি। আমার কর্ণ তাহার একটীও বর্ণ

হারায় নাই। অনেক আড়ম্বর সাজাইয়া ফটীকচাঁদ তোমার পিতার নিকট লোক পাঠাইয়া দিয়াছে।"

"দিয়াছে!" চমকিতা হইয়া নবদুর্গা একটু চীৎকারস্বরে কহিলেন, "সত্যই কি লোক পাঠাইয়া দিয়াছে? তিনি কি তবে আসিবেন?"

"বোধ করি, তত কথা শুনিলে এই রাত্রেই তিনি আসিবেন।"

"আসিলে আমরা তখন তবে কি করিব?"

"তাহাই ত চিন্তা করিতেছি। তুমি এখানে আসিয়াছ, তাহা তিনি জানেন না। আমার উপর তাঁহার রাগ আছে। তোমাকে আমাকে এখানে দেখিলে নিশ্চয়ই তিনি একটা অনর্থ বাধাইবেন। আরও যদি—ফটীকচাঁদ শেষে যে কথা বলিয়াছে,—আরও যদি সেই কথা প্রমাণে পুলিষে খবর দেয়, তবেই ত বিষম বিভ্রাট!"

"তবে এখন উপায়?" সহসা চপলার মত দাঁড়াইয়া শশিকান্তের নয়নে বিস্তৃত নয়ন নিক্ষেপ করিয়া বিস্মিতভাবে নবদুর্গা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এখন উপায়?"

"ঠাওরাও দেখি!" চিন্তিতভাবে শশিকান্ত কহিলেন, "ঠাওরাও দেখি!"

নবদুর্গা ঠাওরাইতে লাগিলেন। মাথা হেঁট করিয়া অনেকক্ষণ ঠাওরাইলেন। শেষে মাথা তুলিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমি ঠাওরাইতেছি, তুমি যাও, দেখ গিয়া তাহারা আরও বা কি করে। যাও, কিন্তু অধিক বিলম্ব করিও না, শীঘ্র আসিও। আমি একাকিনী থাকিলাম।"

"তোমার কি ভয় করিতেছে ?"

"না।—ভয় করিতেছে না। কিন্তু বেশীক্ষণ একাকিনী থাকিলে ভয় হওয়াও অসম্ভব নয়! তুমি শীঘ্র আসিও।"

সপ্তম কল্প।

প্রতিমা নিরঞ্জন।

মৃদু পদে শশিকান্ত চলিয়া গেলেন। এক বার ঊর্দ্ধ দৃষ্টে চাহিয়া তেজস্বিনী নবদুর্গা শয্যার উপর গিয়া বসিলেন। সেখানে আলো কিছু কম ছিল, বসিয়া বসিয়া তিনি কি করিলেন, তিনিই জানেন। চক্ষু দুটী যেন নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিলেন। একটু পরেই শশিকান্ত প্রত্যাগত। আসিয়াই দেখেন, ঐ অবস্থা। তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নবদুর্গা! কি করিতেছ?"

নবদুর্গা কথা কহিলেন না। হাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শঙ্কিতভাবে শশিকান্ত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "নবদুর্গা! তোমার হাতে ওটা কি?"

নবদুর্গা কথা কহিলেন না। বিজয়া-বৈকালে সুসজ্জিতা কাত্যায়নী-প্রতিমা যেমন অল্পে অল্পে হেলিয়া হেলিয়া স্রোতের জলে পড়িয়া যান, ঠিক তেমনি ভাবে হেলিয়া হেলিয়া ম্লানমুখী নবদুর্গা শয্যার উপর ঢলিয়া পড়িলেন। আর চৈতন্য নাই। সমস্ত শরীর অবশ। শশিকান্তের ভয় হইল। চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "নবদুর্গা! নবদুর্গা!"

উত্তর নাই। নবদুর্গার অবশ হস্তে শশিকান্ত দেখিলেন, এক খণ্ড ক্ষুদ্র কাগজ। চঞ্চল হস্তে শশিকান্ত সেইখানি আকর্ষণ করিয়া লইলেন। কাগজে কিছুই লেখা নাই; কোন বস্তুও নাই। উৎকণ্ঠিতভাবে গুটিসুটি করিয়া কাগজ দূরে নিক্ষেপ করিলেন। আবার ডাকিলেন, "নবদুর্গা!" মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া সজল নয়নে কম্পিত কণ্ঠে পুনঃ পুন ডাকিলেন, "নবদুর্গা! নবদুর্গা!"

কে উত্তর দিবে? নবদুর্গা চৈতন্যশূন্য! দেহ স্পন্দশূন্য! ক্রমে ক্রমে সমস্ত শরীর মৃতের ন্যায় শীতল।

শশিকান্ত কাঁপিতে লাগিলেন, দুটী চক্ষে দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল। রোদন করিতে করিতে ত্রস্তপদে বাহিরে আসিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ঘন ঘন হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিতে লাগিলেন, "ফটীকচাঁদ! ফটীকচাঁদ! শীঘ্র! শীঘ্র! সর্ব্বনাশ উপস্থিত! সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!! শীঘ্র! শীঘ্র!"

শশিকান্তের সহিত কথা কহা ফটীকচাঁদের ইচ্ছা ছিল না, ঈর্ষায় জাত-ক্রোধ; কিন্তু অবস্থা দর্শনে কতক কৌতূহলে, কতক সন্দেহে, তাচ্ছীল্যভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের সর্ব্বনাশ? কিসের জন্য শীঘ্র? হইয়াছে কি?"

"নবদুর্গা নাই!" অশ্রুপ্রবাহে কপোল ও বক্ষ প্লাবিত করিয়া শশিকান্ত উত্তর করিলেন, "নবদুর্গা নাই! নবদুর্গা অচেতন! সর্ব্বাঙ্গ হিম! জীবনের কোন লক্ষণ নাই! সর্ব্বনাশ হইয়াছে! হায়! হায়! কি হইল ফটীকচাঁদ!"

ফটীকচাঁদ স্তম্ভিত হইলেন। নেসা তখন তাঁহার শরীরে সম্পূর্ণরূপ আধিপত্য করিতেছিল। চমকিত হইয়া কহিলেন,

"একি ভয়ঙ্কর কথা! একেবারে অচেতন! একেবারে নাই! একেবারে হিম! একি ভয়ঙ্কর কথা! কতক্ষণ এরূপ হইয়াছে?"

"তত কথা আমি বলিতে পারি না, তর্ক বিতর্কের সময় নাই। তুমি শীঘ্র আইস!" ত্রস্তভাবে এই তিনটী কথা বলিয়া শশিকান্ত কাঁদিতে কাঁদিতে ত্রস্তপদে অগ্রসর, ত্রস্তপদে অনুগামী ফটীকচাঁদ।

যে গৃহে নবদুর্গা অচেতন, উভয়ে এক সঙ্গে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। শয্যার উপর নবদুর্গা সমভাবে অচেতন অবস্থায় শায়িত, বদন বিবর্ণ, শরীর অসাড়।

ফটীকচাঁদের চক্ষে একটু জল আসিল। যুগল হস্তে যুগল নেত্র মার্জ্জন করিয়া শয্যার উপর উঠিতে যাইতেছিলেন; নিষেধ করিয়া শশিকান্ত কহিলেন, "স্থির হইয়া থাক; স্পর্শ করিও না। পবিত্র কুমারীর পবিত্র দেহ স্পর্শ করিতে নাই। স্থির হইয়া দাঁড়াও।"

ফটীকচাঁদ বিরক্ত হইলেন। কিঞ্চিৎ দূর হইতে নবদুর্গাকে দর্শন করিয়া আপনা আপনি কহিলেন, "বোধ করি মূর্চ্ছা হইবে! বোধ করি মূর্চ্ছা হইবে! উঁ হুঁ! তাহা হইতে পারে না। আর কিছু—না, মূর্চ্ছাই হইবে!"

কথাগুলি ফটীকচাঁদ আত্মগত বলিলেন বটে, কিন্তু নিতান্ত মৃদুস্বরে নয়। শশিকান্ত সেগুলি স্পষ্ট স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। হস্ত বিস্তার করিয়া কহিলেন, "আহা! তাহাই হউক! ঈশ্বর তাহাই করুন! ফটীকচাঁদ! তোমার মঙ্গল হউক! নবদুর্গার এই অবস্থা আর চক্ষে দেখিতে পারা যায় না। ঈশ্বরেচ্ছায়

ইহা যেন মূর্চ্ছাই হয়। তাহা হইলে আমরা একটু পরেই আবার নবদুর্গার নবজীবন দর্শন করিতে পাইব।”

ফটীকচাঁদের বদন আরক্তবর্ণ ধারণ করিল। ফটীকচাঁদ ভাবিলেন, “শশিকান্ত তবে আমার প্রতি নিতান্ত বিরূপ নহেন। যখন মঙ্গল কামনা করিতেছেন, তখন অবশ্যই ভাল বাসেন। নবদুর্গা বাঁচিয়া উঠিলে আমি শশিকান্তকে বলিব, নবদুর্গাকে পাইলেই আমার মঙ্গল হয়। শশিকান্ত কি তাহাতে রাজি হইবে না? অবশ্য হইবে।” এইরূপ ভাবিয়া উৎসাহের স্বরে পুনরায় কহিলেন, “শশিকান্ত! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এটী মূর্চ্ছা। অচিরেই নবদুর্গা উঠিয়া বসিবে।”

শশিকান্ত একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন। ফটীকচাঁদের শেষ কথা ভাল করিয়া শ্রবণ করেন নাই। কেবল মূর্চ্ছা বাক্যটী কর্ণপটে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। অল্পক্ষণ নীরবে থাকিয়া শশিকান্ত মৃদুস্বরে কহিলেন, “আমারও তাহাই বোধ হয়। ভাই ফটীক! তুমি একটী অন্যায় কার্য্য করিয়াছ, সরলা কুমারীর প্রাণে অকারণে ব্যথা দিয়াছ। নবদুর্গা পলায়ন করিতেছেন, আমি নবদুর্গাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছি; এই কথা তুমি—এই অমূলক কথা তুমি নবদুর্গার পিতাকে জানাইবে, পুলিষে সংবাদ দিবে, একটু পূর্ব্বে ইহাই বলিয়া নবদুর্গাকে তুমি ভয় দেখাইয়া গিয়াছ। সেই ভয়েই হয়ত সরলা বালা মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন। অসম্ভব বোধ হয় না। আহা! মূর্চ্ছাই সত্য হউক।” মৌনভাবে শয্যার অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া শশিকান্ত ও ফটীকচাঁদ উৎকণ্ঠিতভাবে নবদুর্গার মূর্চ্ছাভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বাতাসের পক্ষী যেমন দ্রুতগতি আকাশে উড়িয়া যায়, ধনুক হইতে ছাড়িয়া দিলে তীর যেমন ছুটিয়া যায়, সময় তাহা অপেক্ষাও আশুগতি। সময়কে কেহই ধরিয়া রাখিতে পারে না। সম্পদেরও সময় ছুটিয়া চলে, বিপদেরও সময় ছুটিয়া চলে। প্রভেদ এই যে, বিপদের সময়টী কিছু মন্থর। ছুট আছে, তবে কিছু থামিয়া থামিয়া ছুট।

অর্দ্ধ দণ্ড, এক দণ্ড, ক্রমে দুই দণ্ড অতীত; নবদুর্গার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল না। আরও এক দণ্ড, আরও দুই দণ্ড, তথাপিও নয়। ক্রমশই শশিকান্তের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি। অল্পে অল্পে শয্যাস্পর্শ করিয়া শয্যাশায়িনীর নাসাপুট পরীক্ষা করিলেন, শ্বাস প্রশ্বাস অনুভূত হইল না; পরীক্ষকের হৃৎকম্প হইল। কম্পিতহস্তে সংজ্ঞাহীনার শিথিল হস্ত-পদ স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ঠাণ্ডা!

দরদরিতবারি-পূর্ণ লোচনে শশিকান্ত অতিকষ্টে ফটীকচাঁদের মুখের দিকে চাহিলেন। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। অবশেষে অনেক কষ্টে ভগ্নস্বরে কহিলেন, "ফটীকচাঁদ! আর না! এ জন্মে আর নবদুর্গাকে দেখিতে পাইব না! মনে মনে এতক্ষণ যে শঙ্কা করিতেছিলাম; তাহাই ফলিল! আমাদের সমস্ত আশা ভরসা ফুরাইল! বিধাতা অকালে এই পদ্মফুলটী আমাদের আশা-সরোবর হইতে ছিঁড়িয়া লইলেন! হায়! হায়! হায়! নবদুর্গা! নবদুর্গা চক্ষু বুজিয়াছেন, আর চাহিয়া দেখিবেন না। নবদুর্গার রসনা নীরব হইয়াছে। এজন্মে আর সে মধুর বাক্য শুনিতে পাইব না! নবদুর্গার অধর ওষ্ঠ

বিশুষ্ক হইয়াছে! আর সে স্বর্ণ হাস্য আমাদের চক্ষের নিকটে বিজলির মত খেলা করিবে না! হায়! জন্মশোধ সমস্তই নির্ব্বাণ হইয়া গেল!" এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সাশ্রু-নেত্রে নবদুর্গার দিকে চাহিয়া শোকাতুর শশিকান্ত সকরুণ স্বরে কহিলেন, "নবদুর্গা! নবদুর্গা! জন্ম শোধ কি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলে? একটীবার কথা কও! একটু শীতল হই! নবদুর্গা! তোমার—।" আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। পুত্তলিকার মত দণ্ডায়মান থাকিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। নেত্রে অবিরল জলধারা। ফটীকচাঁদেরও নিশ্বাস পড়িল, কিন্তু সে নিশ্বাস ততদূর মর্ম্মভেদী নহে। ফটীকচাঁদেরও চক্ষে জল পড়িল, কিন্তু সে অশ্রু মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া বিগলিত হইল না।

ইতিপূর্ব্বে যে লোক ফটীকচাঁদের বার্ত্তা লইয়া ময়ূরাক্ষীপারে নবদুর্গার পিতার নিকট গমন করিয়াছিল, সেই লোক ফিরিয়া আসিল। সংবাদ কি? সাক্ষাৎ হয় নাই। সেই দিন অপরাহ্নে একটী মোকদ্দমার যোগাড় করিবার নিমিত্ত হরিপদবাবু সিউড়ি যাত্রা করিয়াছেন। সাক্ষাৎ হয় নাই। বার্ত্তাবহ শুনিয়া আসিয়াছে, তথায় অন্ততঃ এক সপ্তাহ বিলম্ব হইবে।

নিশা দ্বিপ্রহর অতীত। উত্তর দিক হইতে বারিসম্পৃক্ত শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। রোদন করিতে করিতে শশিকান্ত কহিলেন, "ফটীকচাঁদ আর কেন! সকলই ত ফুরাইয়া গেল। আর দাঁড়াইয়া কি কর! দেখিতেছ না কি? যাহাতে নবদুর্গার সদ্গতি হয়, এখন তাহারই উপায় দেখা উচিত।

নবদুর্গা তোমাকে বন্ধু বলিয়া জানিতেন, তুমিও নবদুর্গাকে যথেষ্ট সমাদর করিতে ; এখন বন্ধুর কার্য্য কর।”

ফটীকচাঁদ অবনত মস্তকে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার কিয়ৎক্ষণ শোকাভিনয়ের পর ময়ূরাক্ষী নদীর গর্ভস্থ চড়ার উপর চিতা সজ্জীভূত হইল। ফটীকচাঁদের অনুগামী লোকেরা সযত্নে ধরাধরি করিয়া নবদুর্গার অচেতন দেহ লইয়া সেই চিতার উপর সংস্থাপন করিল। তৎকালে কিছু কিছু বারি বর্ষণ হইতেছিল। ফটীকচাঁদ রোদন করিতে লাগিলেন। আর আর যাহারা যাহারা সেই স্থানে সেই অবস্থায় নবদুর্গাকে দর্শন করিল, তাহারা সকলেই হায় হায় করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল। শশিকান্তের চক্ষে আর জল নাই। তাঁহার চক্ষু যেন তখন নির্জ্জল পাষাণের মত বিশুষ্ক। চিতার দুই হস্ত অন্তরে শশিকান্ত নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া নয়ন নির্নিমেষে নবদুর্গার বদনে সমাকৃষ্ট। অপরে দেখিলে মনে করিতে পারিত, পাষাণের মূর্ত্তি। সংসারে আর যেন কোন মায়া দয়া নাই, জগতের কোন পদার্থই যেন আর তাহার নয়নে প্রতিবিম্বিত হইতেছে না, ঠিক সেইভাবে উদাসনেত্রে এক বার আকাশ দর্শন করিলেন। আকাশ পরিষ্কার। কোথাও আর মেঘ নাই। হঠাৎ সেই নিশ্চল মূর্ত্তির মুখে কথা ফুটিল। চীৎকারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “নবদুর্গা! নবদুর্গা!! একাকিনী যাইও না। আমি যাইব। আমি তোমার সঙ্গে যাইব। একাকিনী অচেনা পথে কোথায় যাইবে। আমি তোমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইব। নবদুর্গা! তুমি চলিলে, আমি আর কাহার জন্য বাঁচিয়া থাকিব! সংসারে আর আমার

আশা কি! আশ্রয় কি! অবলম্বন কি! ফটীকচাঁদ! যদি কিছু দোষ করিয়া থাকি, ক্ষমা করিও। নবদুর্গাশূন্য পৃথিবীতে আর আমি থাকিব না! জগদীশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।” ত্বরিতস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে কলের পুতুল যেমন যন্ত্র-বলে ছুটিয়া যায়, সেইভাবে শোকসন্তপ্ত শশিকান্ত এক লম্ফে সেই চিতার উপর—নবদুর্গার দেহের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। স্পন্দ নাই, বাক্য নাই, শোক নাই,—কিছুই নাই। ঠিক প্রাণশূন্য নিশ্চেষ্ট দেহ।

ফটীকচাঁদের অন্তঃকরণ অতি লঘু। নবদুর্গার জন্য চক্ষের জল ফেলিয়া ছিলেন, নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন, তাহার হেতু অন্য প্রকার। শশিকান্তকে চিতায় ঝাঁপ দিতে দেখিয়া সেই লঘু হৃদয়ে তখন প্রতিহিংসা বলবতী হইল! তখন আর ঈর্ষা জন্মিবার কারণ বিদ্যমান ছিল না; তথাপি ঈর্ষাভাবে ফটীকচাঁদ ভাবিলেন, “বেশ হইল! নবদুর্গা ত গিয়াছে, তবে আর সংসারে আমার প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বী বাঁচিয়া থাকিবে কেন? নবদুর্গা বাঁচিয়া থাকিলে আমিই উহার জীবন সংহার করিতাম; এখন তাহা করিতে হইল না। সে যখন ইচ্ছা করিয়া পুড়িয়া মরিবার জন্য নিজেই চিতায় ঝাঁপ দিয়াছে, তখন আর আমার পাপ নাই। বিশেষ, রাত্রিকাল, নির্জ্জন প্রদেশ, কেই বা ইহা জানিতে পারিবে?” মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ফটীকচাঁদ আপনার সঙ্গী লোকদিগের দিকে ইঙ্গিত করিলেন। লোকেরা চিতা-শায়ী দেহ দুটীর উপর কাষ্ঠাচ্ছাদন দিতে আরম্ভ করিল। দুটী দেহই সমভাবে নিঃষাড়।

ফটীকচাঁদের মনে আর এক তর্ক। অগ্নি দিবে কে? সঙ্গে

সঙ্গেই মীমাংসা। "নবদুর্গার পিতা হরিপদবাবু আমাকেই কন্যাদান করিবেন বলিয়া বাক্যদান করিয়াছিলেন, হিন্দুশাস্ত্র-মতে আমিই নবদুর্গার পতি, আমি অগ্নিদান করিব!" এই তর্কের এই মীমাংসা করিয়া এক প্রজ্জ্বলিত উল্কাহস্তে প্রেমাধার (!) ফটীকচাঁদ প্রণয়িনীর পবিত্র গাত্রে অগ্নিদান-মানসে চিতাসমীপবর্ত্তী হইলেন।

ময়ূরাক্ষী নদীর অতি অপূর্ব্ব চমৎকার খেলা! আছেত আছে পূর্ণ জলময়ী, আছে ত আছে মরুভূমির মত শুষ্ক বালুকাময়ী, বিন্দুমাত্র জল নাই। হটাৎ যদি আকাশের পশ্চিম কোণে মেঘোদয় হয়,—বৃষ্টি হইতে ভর সয় না, নদী এককালে জলে পরিপূর্ণ হইয়া তরঙ্গিত হইতে থাকে। ময়ূরাক্ষীর গর্ভশয্যা প্রস্তর-সৈকত কঙ্কর ভূমিতে সজ্জিত। তাহাতে বিন্দুমাত্র জলও শুষিয়া লয় না। যখন জল থাকে, তখন পূর্ণগর্ভা, নির্ম্মলস্রোত। যখন নির্জ্জল, তখন কাঁকরগুলি মুক্তার মত চিক্ চিক্ করে; তখনও চমৎকার শোভা। লোকে অনায়াসে হাঁটিয়া পার হয়। অদূরে ছোট ছোট পাহাড়। পাহাড়ের দিকে মেঘ উঠিলে এক প্রকার ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতে থাকে; বোধ হয় যেন দূরে বৃষ্টি হইয়াছে। তাহার পরেই নির্জ্জল গর্ভ জলপূর্ণ হয়। যে রাত্রের কথা হইতেছে, সে রাত্রেও ময়ূরাক্ষীর ঐরূপ প্রকৃতিসিদ্ধ ক্রীড়া। যখন নবদুর্গা আইসেন, তখন শুষ্ক নদী; আকাশের পূর্ব্ব কোণে একটু মেঘ ছিল। যখন ফটীকচাঁদ আইসেন, তখনও উত্তরে একটু মেঘ। মধ্যে এক বার গুঁড়ুনি গুঁড়ুনি বৃষ্টি পড়িয়াছিল, বাতাস বহিয়াছিল। যখন চিতা সজ্জিত হয়,

চিতার উপর যখন নবতুর্গার দেহ স্থাপিত হয়, তখনও ময়ুরাক্ষী শূন্যগর্ভ। শশিকান্ত যখন চিতায় ঝাঁপ দেন, তখন আকাশ দিব্য পরিষ্কার। ফটীকচাঁদ যখন অগ্নিদানে অগ্রসর, তখনও নদী সিকতাময়ী। অকস্মাৎ একটা হাওয়া উঠিল, অকস্মাৎ বারি-প্রবাহে প্রবাহিনী পরিপূর্ণ। কাষ্ঠময় চিতা সহ নবদুর্গা ও শশিকান্তের কাষ্ঠাচ্ছাদিত দেহ তরঙ্গিনীর প্রবল তরঙ্গে ভাসিয়া গেল! লোকেরা তীরে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। ফটীকচাঁদ প্রাণভয়ে কম্পিত হস্তে উল্কা নিক্ষেপ করিয়া সিক্ত বস্ত্রে কাঁপিতে কাঁপিতে তীরে উঠিলেন। তাঁহাকে প্রায় দশ হাত নদীতে সাঁতার দিয়া ভাসিয়া আসিতে হইয়াছিল।—দশ হাতে দশ বার হাবু ডুবু।

অষ্টম কল্প।

খুনী মোকদ্দমা।

এক বৎসর অতীত। সত্য সত্যই শারদাসুন্দরীর সহিত ফটীকচাঁদের বিবাহ হইয়াছে। নবতুর্গার শোক ফটীকচাঁদের হৃদয়ে অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। এক মাসের মধ্যেই তিনি নবতুর্গাকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। না ভুলিলেই বা কি হইত? নবতুর্গা থাকিতে থাকিতেই ফটীকচাঁদ মনে মনে কল্পনা করিয়াছিলেন, "রাজাদের অনেক রাণী থাকে; আমারও সেইরূপ দুই রাণী হইবে, নবদুর্গা আর শারদাসুন্দরী।" নবতুর্গার প্রতি ফটীকচাঁদের এত ভালবাসা!

শারদাসুন্দরী ফটীকচাঁদের রাণী হইয়াছেন, ফটীকচাঁদ রাজা হইয়াছেন। রাজা ফটীকচাঁদ এক দিন বেলা এক প্রহরের সময়, আপন প্রাসাদের (?) চৌকাঠের উপর বসিয়া ধূম পান করিতেছিলেন, এমন সময় সেই খানে দুই জন অপরিচিত লোক আসিল। এক জন কৃষ্ণবর্ণ বঙ্গবাসী, আর এক জন শ্মশ্রুধারী পিঙ্গলবর্ণ ব্রজবাসী। ফটীকচাঁদকে সম্বোধন করিয়া বঙ্গবাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম ফটীকচাঁদ অধিকারী"? ধূম উড়াইয়া যেন কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে ফটীকচাঁদ উত্তর করিলেন, "হাঁ, আমরই নাম।"

"প্রথম প্রশ্নকর্ত্তা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "ময়ূরাক্ষী তীরে প্রবালকুঞ্জ নামে এক উদ্যান আছে, তাহা তুমি জান?"

ফটীকচাঁদের গা কাঁপিল। কম্পিত হস্তে হুঁকাটী নামাইয়া রাখিয়া কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিয়া, হুঁকাস্বামী উত্তর দিলেন, "শুনিয়াছি আছে; সেখানে আমি কখনও যাই নাই।"

"সত্য কথা বলিও।"

"আমি সত্য ভিন্ন মিথ্যা কহিতেছি না।"

"তথাপি পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া উত্তর করা ভাল। সত্য কথায়——"

শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই যেন কিছু ব্যস্ত স্বরে কম্পিত কণ্ঠে ফটীকচাঁদ কহিলেন, "তুমি কি আমাকে হলফ্ করাইতে আসিয়াছ? আমি ধর্ম্মের দাস। একমেবাদ্বিতীয়ম্ আমার নিত্য মন্ত্র।"

"তাহা হইতে পারে। কিন্তু যেন স্মরণ থাকে।"

"সে স্মরণে তোমার কি প্রয়োজন?"

"প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন না থাকিলে জিজ্ঞাসা করিতেছি কেন?" শীঘ্র শীঘ্র সংক্ষেপে এই কথা বলিয়া প্রশ্নকর্ত্তা বঙ্গবাসী মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিলেন। ব্রজবাসীও মুখ ফিরাইয়া হাসিল। তাঁহাদিগের ভাব দেখিয়া ফটীকচাঁদ বিমর্ষ মুখে, ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিলেন, ক্ষণকাল কথা কহিলেন না। মৃদু হাস্য করিয়া বঙ্গবাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁপিতেছ কেন? সত্য করিয়া বল, কোন দিন সে উদ্যানে তুমি গিযাছিলে কি না?"

সুদীর্ঘ হাই তুলিয়া ফটীকচাঁদ আপনার মনে কহিলেন, "একমেবাদ্বিতীয়ম।"

"আমি বেদমন্ত্র শুনিতে আসি নাই। যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার উত্তর কর। সে উদ্যানে কোন দিন তুমি গিয়াছিলে কি না?"

"একটী স্ত্রীলোকের পীড়া হইয়াছিল, সংবাদ পাইয়া—"

"ভূমিকা চাহি না, সাফ্ সাফ্ কথা কও।"

"তাহাই ত কহিতেছি। একটী স্ত্রীলোকের পীড়া হইয়াছিল, তাহাকে দেখিবার জন্য এক দিন—"

"আচ্ছা, বুঝিলাম। স্ত্রীলোকের পীড়া দেখিবার জন্য তুমি সেই উদ্যানে গিয়াছিলে। আচ্ছা, কে সেই স্ত্রীলোক?"

"হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা।"

"তুমি তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলে কেন?"

"আমি তাহাকে ভাল বাসিতাম।"

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের সহিত ফটীকচাঁদের নয়নে দুই বিন্দু জল আসিল।

পূর্ব্ববৎ মৃদু হাস্য সহকারে মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক বঙ্গবাসী কহিলেন, "কাঁদিতে আরম্ভ করিলে কেন? তাহার পর সে স্ত্রীলোক কোথায় গেল?"

"তোমার অত কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন?"

"প্রয়োজন পরে বলিব। এখন উত্তর কর, সে স্ত্রী লোক কোথায় গেল?"

"কোথায় আর যায়! মরিয়া গেল। ময়ূরাক্ষীর জলে ভাসিয়া গেল।"

"আর শশিকান্ত?"

ফটীকচাঁদ চমকিয়া উঠিলেন। বিশুষ্ক কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "শশিকান্তও ভাসিয়া গেল।"

বঙ্গবাসী হাস্য করিয়া কহিলেন, "সেই কথাই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। এখন হুজুরের আদেশে তুমি আমার বন্দী। আমি তোমাকে বন্দী করিলাম।"

হুকুমের স্বরে এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া বঙ্গবাসী আপন সঙ্গী ব্রজবাসীর প্রতি সভ্রুভঙ্গি অনুমতি করিলেন, "এই আসামীর হাতে হাত কড়ী বান্ধিয়া থানায় লইয়া চল।"

কাঁপিতে কাঁপিতে ফটীকচাঁদ কহিলেন, "কেন?—কেন?—কি জন্য?—আমার অপরাধ?"

"তোমার নামে নর-নারী হত্যার অভিযোগ হইয়াছে। আমি পুলিষের দারোগা। হুজুরের পরোয়ানা মতে তোমার অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিলাম, গোয়েন্দারা শুদ্ধ নাম বলিয়াছিল, বাটীর ঠিকানা বলে নাই; সেই জন্য ধরিতে বিলম্ব হইয়াছে।"

"তাহারা মরিয়াছে। তাহারা ভাসিয়া গিয়াছে। ময়ূরাক্ষীর স্রোত তাহাদিগকে চিতার সঙ্গে কত দূরে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, আমি তাহার কি তত্ব অবগত হইতে পারিব? আমি অপরাধী নই। তাহারা আপনারাই মরিয়াছে। আমি—"

"আমি তোমার বক্তৃতা শুনিবার জন্য এখানে উপস্থিত হই নাই। জমাদার! শীঘ্র বন্ধন করিয়া লইয়া চল।"

পাঠক মহাশয় বুঝিলেন, নবদুর্গার ও শশিকান্তের মৃত্যু অথবা নিরুদ্দেশ সংবাদের তদন্ত হইতেছে। দারোগার হুকুম শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফটিকচাঁদ কহিলেন, "বেঁধো না বাবা! অত্যাচার করিও না। আমি খুন করি নাই! তাহারা আপনারা মরিয়াছে! আমি গরিব লোক, যথাশক্তি তোমাদের পূজা দিব, বেঁধোনা!"

দারোগা হাস্য করিলেন। পূজার লোভে হৃদয়ে একটু দয়া আসিল। জমাদারকে কহিলেন, "আচ্ছা এখন হাত-কড়ি থাকুক, উহার বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিলেই চলিবে। আপন জিম্মায় লও, পলাইতে না পারে।" আসামীকে কহিলেন, "আচ্ছা, পূজার কি কি আয়োজন আছে, বাহির কর।"

"একটু বিলম্ব করিতে হইবে। আপনাদিগকে একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। নিকটে কিছু উপস্থিত নাই, শ্বশুর মহাশয়ের নিকট হইতে——"

চালচিত্রের পশুপতি অবধি নীচের সিংহ, অসুর, নাগ-পাশের নাগ, কার্ত্তিকের ময়ূর, গণেশের ইন্দুর, রঘুনাথের হনু, ভোলানাথের ষাঁড় পর্য্যন্ত সকলেই পূজার লোভে পাগল। জমাদার ভাবিল, এ পূজার অংশ তাহার ভাগ্যে ঘটা কঠিন।

সুতরাং তাহার ঘটে এক উপস্থিত বুদ্ধি জোগাইল। দারোগাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "হুজুর! গোয়েন্দার এজাহারে আছে, ফৌত হওয়া স্ত্রীলোকের গহনার লোভে আসামী তাহাকে নষ্ট করিয়াছে। ইহার গৃহে খানাতল্লাসী আবশ্যক।"

কর্ত্তব্য বোধে দারোগা মহাশয় তাহাতেই সম্মত হইলেন। ফটীকচাঁদের গৃহে খানাতল্লাসী করা হইল। গৃহের যে সকল আসবাবের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা ছাড়া একটী টীনের বাক্স মধ্যে পাঁচ সাত খানি স্বর্ণালঙ্কার বাহির হইল। দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ অলঙ্কার কাহার?"

ফটীকচাঁদ উত্তর করিলেন, "পূর্ব্বে নবদুর্গার ছিল, এখন আমার।"

"তোমার কিরূপে হইল? চুরি করিয়া লইয়াছ?"

"না। চুরি করিয়া লই নাই। নবদুর্গা আমাকে দিয়া গিয়াছে।"

"কি জন্য? তাহার সহিত তোমার কি সম্পর্ক ছিল?"

"তাহার সহিত আমার বিবাহ হইবার কথা হইয়াছিল।"

"বিবাহ হইবার কথা হইলে কি কেহ বিবাহের অগ্রে কোন পুরুষকে অলঙ্কার দান করে?"

"তাহা আমি জানি না। নবদুর্গা আমাকে দিয়া গিয়াছে, ইহাই সত্য কথা।"

দারোগা কহিলেন, "বিশ্বাস হইতেছে না। এই গহনার লোভেই তুমি নবদুর্গাকে খুন করিয়াছ।"

দারোগার আদেশে ফটীকচাঁদ বন্ধনগ্রস্ত হইলেন। অলঙ্কারগুলি জমাদারের হেফাজতে রহিল। ফটীকচাঁদ ক্রন্দন

করিতে করিতে তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। শারদাসুন্দরীর পিত্রালয়ের সম্মুখ দিয়া থানায় যাইবার পথ। ফটীকচাঁদ কাতর হইয়া মিনতি করাতে দারোগা মহাশয় সদয় ভাবে শ্বশুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দিলেন। সাক্ষাৎ হইল। জামাতাকে পুলিষ-বেষ্টিত বন্ধনগ্রস্ত দর্শন করিয়া এবং দারোগার মুখে মামলার সার ভাগ শ্রবণ করিয়া, শারদা-সুন্দরীর পিতা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। ফটীকচাঁদ অশ্রুপূর্ণ নয়নে বারম্বার কহিতে লাগিলেন, "মহাশয়! আপনি যদি দয়া করিয়া আমার জন্য জামিন হন, তাহা হইলে বন্ধন দশায় থাকিতে হয় না।" শ্বশুর ঠাকুর উত্তর করিলেন না। বোধ হয় ভাবিতেছিলেন, "ফৌজদারী মামলায় জামিন হইয়া কি ফাঁসাতে পড়িব!" বাস্তবিক জামিন হইতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। মুখে কিছু বলিবার অগ্রে দারোগা মহাশয় বলিলেন, "খুনি মামলার জামিন চলে না। বিশেষ জামিন গ্রহণে আমার অধিকার নাই। তোমার শ্বশুর যদি মোকদ্দমার সময় অন্য প্রকারে সাহায্য করিতে চান, তাহাতে আপত্তি নাই।"

দারোগার আপত্তি থাকুক না থাকুক, শ্বশুরের আপত্তি আছে বোধ হইল। এত কথার মাঝে তিনি একটী হাঁ কি না, কিছুই বলিলেন না। দারোগা ফটীকচাঁদকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। পথে যাইতে যাইতে ফটীকের কল্পনা-পথে আর এক যুক্তির আবির্ভাব। একবার জমাদারের দিকে চাহিয়া দারোগাকে কহিলেন, "আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেছেন। আমার সাহায্য-কর্ত্তা আর কেহই নাই, এক জন মাত্র আছেন; তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে

ইচ্ছা করি।" কি চিন্তা করিয়া একটু পরেই আবার বলিলেন, "তাহার মধ্যেও একটী কথা আছে। গহনা কখানির কথা তাঁহার কাছে যদি প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে আমি আপনাদের গোলাম হইব, যথা শক্তি পূজা দিব। ফল কথা—পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাই সত্য। গহনাতে আমার পাপ নাই, আমি অপহরণ করি নাই; নবদুর্গা স্ব ইচ্ছায় দিয়া গিয়াছে। আপনি দয়া করিলেই রক্ষার উপায় হয়।"

প্রলোভনের খাতিরে দারোগা সম্মত হইলেন। কিঞ্চিৎ বক্রপথে আসামীকে লইয়া তাঁহারা এক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে বাটী হরিপদ বাবুর। ফটীকচাঁদ মহা বিপদাপন্ন, ইহা দর্শন করিয়া হরিপদবাবু বাস্তবিক কাতর হইলেন। ফটীকচাঁদ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "আপনার পায়ে ধরি, আমাকে রক্ষা করুন, আমি কোন অপরাধ করি নাই। বোধ করি, দুষ্ট লোকে চক্র করিয়া মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়াছে। সর্ব্বৈব মিথ্যা।"

পুলিষের লোকদিগের সম্মুখ হইতে কিঞ্চিৎ অন্তরে গিয়া হরিপদ বাবুর সঙ্গে বন্দীর কি গুপ্ত কথা হইল; পুলিষ তাহা শুনিতে পাইল না।

হরিপদ বসুর মুখের ভাব অন্য প্রকার হইল। তিনি ভাবিলেন, "মেয়েত গিয়াছেই, তবে আর এ দাঁওটা ছাড়ি কেন? যদি খালাস হয়, তাহা হইলেও আমার; আর যদি ফিরিয়া না আসে, তাহা হইলেও আমার। আমরা বিষয়ী লোক; অর্থই আমাদের সর্ব্বস্ব। টাকা অপেক্ষা মেয়ে বড় নয়। অর্থই লক্ষ্মী, কন্যা অলক্ষ্মী। গৃহের লক্ষ্মী দিয়া অলক্ষ্মীকে শাসন ও বিদায়

করিতে হয়। মাতা ও পিতামহীরা দীপান্বিতা অমাবস্যা রজনীতে লক্ষ্মীপূজার অগ্রে কুলা বাজাইয়া অলক্ষ্মী বিদায় করিতেন। আমাকে আর তাহা করিতে হয় নাই। আপনা হইতেই পাপ চুকিয়া গিয়াছে। এখন পাপের পরিবর্ত্তে পুণ্যের উদয় হইল, অর্থ লক্ষ্মী সহজে আপনাহইতেই লাভ হইতে চলিল, ইহা কি পরিত্যাগ করিতে আছে? এ সুযোগ কথনই ছাড়িব না।" মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তিনি সম্মতি-সূচক আশ্বাস প্রদান করিলেন। দারোগাকে কহিলেন, "ক্ষণ কালের জন্য ইহার বন্ধন মুক্ত করুন, আমার একটু প্রয়োজন আছে।" দারগা মহাশয় সুধু কথার ভিজিবার লোক ছিলেন না। উকীলদিগের আগমনী, দর্শনী,পরামর্শী, এবং অন্যান্য বিধিসিদ্ধ অঙ্কের ন্যায় দারোগা মহাশয়েরও অনেক প্রকার অবিধিসিদ্ধ পুরস্কার গ্রহণের অভ্যাস ছিল। আশা পূর্ণ হইল। যে যেমন পাত্র, তাহার তদ্রূপ পূজা। প্রথানুসারে জমাদারও প্রসাদ পাইল।

ফটীকচাঁদ পাঁচ মিনিটের জন্য বন্ধন মুক্ত হইলেন। হরিপদ বাবু ভুখড় বিষয়ী লোক। তাঁহার গৃহে প্রায় সর্ব্বদাই ষ্ট্যাম্প কাগজ প্রস্তুত থাকিত। এক খানি উচিত মূল্যের কাগজে ফটীকচাঁদের শুদ্ধ নামটী স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। তাঁহার মনস্কামনা সেই নামের সঙ্গেই সিদ্ধ হইল। পুলিষের লোকেরা দস্তুরমত কাজ করিল।

তাহার পরেই মোকদ্দমা। মাজিষ্ট্রেটের এজ্‌লাস হইতে সেশন আদালতে সমর্পণ। দায়রায় বিচারে চারি জন সাক্ষী। প্রথম, প্রবাল কুঞ্জের উদ্যান-পাল রত্নেশ্বর দাস; দ্বিতীয়, রামময় ঘটক; তৃতীয়, বংশলোচন রায়; চতুর্থ, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, ফটীকচাঁদ যে দিন নবদুর্গার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত প্রবল কুঞ্জে গমন করেন, সেই দিন তাঁহার সঙ্গে তিন জন লোক ছিল। সাক্ষী-দিগের মধ্যে রামময় ঘটক আর বংশলোচন রায় তাহাদেরই দুই জন। তৃতীয় ব্যক্তি পলাতক। বংশলোচন প্রথমে আসামী-শ্রেণীতে ছিল, পরে রাজপক্ষে সাক্ষী হইয়া মাপ পাইয়াছে। রত্নেশ্বর স্পষ্ট জবানবন্দী দিল, নবদুর্গার সহিত ফটীকচাঁদের যখন উদ্যানের কথাবার্ত্তা হয়, গোপনে থাকিয়া সে তখন শুনিয়াছিল। নবদুর্গা বলিয়াছিলেন, "গহনাগুলি লও, আমাকে প্রাণে মেরো না।" ঐরূপ আরও অনেক কথা হইয়াছিল। তাহার পরেই রাত্রিকালে অকস্মাৎ নবদুর্গার মৃত্যু হয়। মালী আরও বলে, ফটীকচাঁদ নিজে শশিকান্তকেও চিতায় ফেলিয়া দিয়াছিল। বংশলোচনের জবানবন্দীতে প্রকাশ, শশিকান্ত নিজে চিতায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন। রামময় ঘটক দুই একটী ছাড়া ছাড়া কথা বলে; তাহাতেও খেলাপ হয়। শেষে হরিপদ চট্টো-পাধ্যায়ের জোবানবন্দী। তিনি কহিলেন, "ময়ূরাক্ষী তীরের প্রবাল কুঞ্জে আমার কন্যা নবদুর্গার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়াছি। শশিকান্তের সহিত তাহার পরিণয় ইচ্ছা হইয়া-ছিল, পরস্পরের অনুরাগও জন্মিয়াছিল। নবদুর্গার শোকে শশি-কান্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়াছিল, ইহাও শুনিয়াছি। কিন্তু ফটীকচাঁদ তাহাদিগকে খুন করিয়াছে, এমন আমার বিশ্বাস হয় না।"

হরিপদের সাক্ষ্য-বাক্যে নির্ভর করিয়া এবং অন্যান্য সাক্ষীর খেলাপ দেখিয়া জজ সাহেব ফটীকচাঁদকে বেকসুর খালাস দিলেন।

প্রায় দুই মাস ধরিয়া মোকদ্দমা হইল, উকিল মোক্তারের খরচা, আমলা ও পুলিসের উদর পূজা, এবং পুরস্কার প্রভৃতি নানাবিধ উপসর্গে প্রায় পাঁচ সহস্র টাকা উড়িয়া গেল। টাকাগুলি সমস্তই যে হরিপদ বাবুর ভাণ্ডারের, একথা বলা বাহুল্য।

এই স্থলে প্রসঙ্গানুরোধে একটী কথা প্রয়োজন। বাগানের মালী রত্নেশ্বর দাস স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া গোয়েন্দা হইয়াছিল কেন? ফটীকচাঁদের প্রতি তাহার এমন কি আক্রোশ ছিল? সামান্য লোকের আক্রোশ সামান্য কারণেই হয়। নবদুর্গার অলঙ্কারগুলি গ্রহণ করিয়া ফটীকচাঁদ অম্লান মুখে যখন আত্মসাৎ করেন, গুপ্ত শ্রোতা রত্নেশ্বর সেই সময় কিছু পুরস্কার প্রার্থনা করিয়াছিল। লাভে হতাশ হওয়াতে রত্নেশ্বর স্থূল কথার উপরে অনেক অলঙ্কার দিয়া পুলিসে সংবাদ দিয়াছিল। সেই সূত্রেই মামলা।

নবম কল্প।

দেব গৃহ সমভূম।

এখন দেখা উচিত হরিপদ বাবুর দাঁও কতদূর সফল হইল। ফটীকচাঁদকে যখন নবদুর্গা দান করিবার অঙ্গীকার করেন, ফটীকচাঁদ সেই সময় তাঁহার পিতৃত্যক্ত গৃহভিত্তি-প্রোথিত গুপ্তধনের আশা অথবা আশ্বাস প্রদান করেন। অবশেষে মোকদ্দমার সময় পুলিস দারোগার অগোচরে জনান্তিকে যখন কানে কানে

কথা হয়, তখনও সেই গুপ্ত ধনের আশ্বাস প্রদান করেন। এখন পরিশোধের সময় উপস্থিত। সাদা ষ্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করা ছিল; লক্ষ্মীভক্ত ধার্ম্মিকবর হরিপদ বাবু সেই ষ্টাম্পে রীতিমত একখানি খত প্রস্তুত করিয়াছেন। মাসিক কুসীদ শতকরা দশ টাকা। স্থদে আসলে যত টাকা দাঁড়াইল, ফটীকচাঁদের নিকট অগ্রে ঘরাও দাবী করিলেন। ফটীকচাঁদ অনেক আপত্তি করিয়া সময় চাহিলেন, উত্তমর্ণ সম্মত হইলেন না। গৃহভিত্তি অন্বেষণ করিবার সঙ্কল্প। অধমর্ণ তাহাতেও অসম্মত। শেষে দস্তুরমত মোকদ্দমা। ধার্ম্মিকবর ইংরাজ-রাজ্যের রাজত্বে অঙ্গীকারের উপর কোন আইন কানুন চলে না। মোকদ্দমায় অবশ্যই হরিপদ বাবুর জয় লাভ হইল। আদায়ের অন্য সম্বল কিছুই ছিল না। স্থিতির মধ্যে জীর্ণ এক-তলা গৃহ; ভাষার ভাসা কথায় রাজা ফটীকচাঁদের প্রাসাদ। সেই প্রাসাদ ভগ্ন না করিলে প্রোথিত গুপ্ত ধন বাহির হইতে পারে না; আদালতের পদাতিক মোতায়নে প্রাসাদ চূর্ণ করাই স্থির। তখন আর ওজর আপত্তি চলিল না। অশ্রুপূর্ণ নয়নে ফটীকচাঁদ নীরব।

এই স্থলে পাঠক মহাশয়কে একটী অপ্রকাশিত তত্ত্ব অবগত হইতে হইবে। যে বাটীতে ফটীকচাঁদের নিবাস, জনশ্রুতির সহস্র রসনায় সেই বাটী দেবতার। পূর্ব্বে অধিকারী কে ছিলেন, নির্ণয় করা নিষ্প্রয়োজন; ফটীকচাঁদের পিতা যখন খরিদ করেন, তৎকালের অধিকারিণী একটী অবীরা বিধবা। অনেকদিন পর্য্যন্ত বাটীখানি অবিক্রীত ছিল, দেবতার ভয়ে কেহই ক্রয় করিতে সাহস করে নাই। অথচ প্রোৎসাহিত,

গৃহমধ্যে অনন্ত গুপ্ত ধনের ভাণ্ডার। লোকে জানিত, মাহেন্দ্র যোগে নির্ম্মিত। রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার অন্যতম রত্ন, বরাহের পুত্র, মিহির যে রজনীতে সস্ত্রীক নিভৃত গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই রজনীতে তিনি শুনিয়াছিলেন, নির্জ্জীব গৃহ আপনা-আপনি "পড়ি,পড়ি" বলিতেছে। খনা সেই মাহেন্দ্রক্ষণের গৃহকে তিন দিক চাপিয়া পড়িতে উপরোধ করেন; আজ্ঞা-বহের ন্যায় গৃহও সেই আজ্ঞা প্রতিপালন করে। অমূল্য রত্ন রাশীকৃত হয়। এই গৃহটীও হয়ত সেইরূপ মাহেন্দ্র ক্ষণে নির্ম্মিত; লোকে তাহাই অনুমান করিত। রাত্রিকালে দেব-লোকেরা খড়ম পায়ে করিয়া ছাদের উপর পরিক্রম করিতেন। এক এক দিন প্রাতঃকালে গৃহ-প্রাঙ্গণে উচ্ছিষ্ট পত্র, কুশাসন, কাষ্ঠাসন, ও পরিত্যক্ত জলপাত্র পতিত থাকিতে লোকেরা দেখিত। নানা প্রমাণে দেবগৃহ বলিয়াই সমস্ত লোকের বিশ্বাস। এক দিন দুই প্রহর রাত্রে প্রবেশদ্বারে পঞ্চাননের বাহনানুরূপ বৃষাকার এক কলেবর দৃষ্ট হইয়াছিল। হস্ত, পদ, পৃষ্ঠ, পুচ্ছ, সর্ব্বাবয়বই বৃষ সদৃশ, কেবল মুখ খানি মানু-ষের। এইরূপ আকারকে সচরাচর লোকে গুমো বলিয়া ডাকে। পঞ্চাননের ন্যায় সেই গুমোর মুখে সৃক্বণী পরিলেহ-মান। হাই তুলিলে মুক্তা বর্ষণ হয়, নিশ্বাসের সঙ্গে নীলকান্ত মণি পরিবর্ষিত হয়; অপূর্ব্ব দর্শন! দেবতাতে লোকের যেমন ভক্তি থাকে, তেমনি একটু একটু আতঙ্কও থাকে। ভয় ভক্তি উভয় কারণে সেই দেবালয় মানুষের বাস-যোগ্য নয় বলিয়া অনেকদিন খরিদ-দার জোঠে নাই। বিধবার শরীরে দেবতাদিগের আবির্ভাব ছিল। লোকান্তর যাত্রা করিবার পূর্ব্বে

সেই বিধবা ঐ আলয়টী হস্তান্তর করিতে অভিলাষিণী হয়। বলা হইয়াছে, কেহই ক্রয় করিতে সাহস করে নাই; ফটীক-চাঁদের পিতা অত্যন্ত ধনলোভী ছিলেন, নাস্তিকের মত সাহ-সও কিছু অধিক ছিল; অতি অল্প মূল্যে তিনি ঐ বাটী খরিদ করেন। চরম কালে উপযুক্ত পুত্রকে সেই গুপ্ত ধনের চরম উপদেশ প্রদান করিয়া যান। তদবধি রাজা ফটীকচাঁদ অনন্ত গুপ্ত ধনের অধিকারী।

আদালত-সহায়ে গৃহটী ভগ্ন করা হইল। কিছুই পাওয়া গেল না। চূর্ণ, চূর্ণ, চূর্ণ করা হইল, তথাপি কিছুই পাওয়া গেল না। তলভাগ খনন করা হইল, তথাপি কিছুই নাই। ধরণী শূন্যগর্ভ! হরিপদ বাবু হতাশ হইলেন, নীরবে ফটীক-চাঁদ রোদন করিতে লাগিলেন। গৃহের আসবাব পাঠক মহাশয়ের অবিদিত নাই; সেগুলি উচ্চ ডাকে নীলাম হইয়া গেল। জীর্ণ ইষ্টকগুলিও জীর্ণ কাষ্ঠখণ্ডের সহিত বিক্রীত হইয়া গেল। মূল ধনের সামান্য ভগ্নাংশও উদ্ধৃত হইল না।

লোভের পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর। লোভে না হইতে পারে, এমন কার্য্য কিছুই প্রায় দেখা যায় না। হরিপদ অন্য লোভের দাস ছিলেন না; ছিলেন কি না, জানিবারও আব-শ্যক নাই; কিন্তু অতিশয় ধনলোভী ছিলেন। ধনলোভে আকৃষ্ট হইয়া অপাত্রে কন্যা-দানে উদ্যত হইয়াছিলেন; আবার সেই ধনলোভে আকৃষ্ট হইয়াই খুনি মামলায় ফটীকচাঁদের সাহায্য করিয়াছিলেন। বহুকালের সঞ্চিত ধন বিনষ্ট হইল। লোভ তাঁহাকে বলিয়াছিল, সংসার ত্যাগ কর। ধন-লোভীর ধনক্ষয় কতদূর মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণাপ্রদ, যাঁহারা ভুক্তভোগী,

তাঁহারাই বুঝেন, তাঁহারাই বুঝিবেন; সকলে বুঝিতে পারে না।

সঞ্চিত ধন বিনষ্ট হইল, এটী কিঞ্চিৎ মিথ্যা কথা। মোকদ্দমায় যত খরচ হইয়াছে, তত টাকা হরিপদ বাবুর হস্তে সঞ্চিত ছিল না। একজন পোদ্দারের নিকট নিজ ভদ্রাসন বন্ধক রাখিয়া তিনি সহস্র টাকা ঋণ লইয়াছিলেন। তাহা পরিশোধ করিবার সময় নিকট হইয়া আসিল। নানা ভাবনায় হরিপদ এক কালে অবসন্ন। লোভের প্রত্যাদেশ, সংসার ত্যাগ কর; আমাদেরও উপদেশ, সংসার ত্যাগ কর।

তিন মাস অতীত। হরিপদ বাবুর ভদ্রাসন বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। আশ্রম-পীড়া যে একটী পাতক, হাতে হাতে তাহার ফল ফলিয়াছে। বাটীর পরিবারেরা কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কে বলিবে? কর্ত্তা স্বয়ং ভারবহ জীবন পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া কয়েক দিন অনাহারে অতিবাহিত করিলেন। উপবাসে শীঘ্র জীবনান্ত হয় না। অনেক যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, অনেক অনুশোচনা করিয়া, মনে মনে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। পাপ কি? সেই অবস্থাপন্ন লোকে ক্ষণকাল চিন্তা করিলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। উপদেশ, সংসার ত্যাগ কর। এত দিনের পর হরিপদ বাবু সেই উপদেশ পালন করিতে বাধ্য হইলেন। নদী-তীরের একটী প্রাচীন তমালবৃক্ষে উদ্বন্ধনে সেই উপদেশ সার্থক করিতেছিলেন; গ্রহ-বশে লতারজ্জু ছিন্ন হইয়া গেল, ভূম্যাকর্ষণ-শক্তি-বলে অর্দ্ধ বিচেতনাবস্থায় ধরাতলে পতিত হইলেন।

দশম কল্প।

এ আবার কে?

ছয় মাস অতীত। একটী ডাক্তারখানা। নিরাশ্রয় ফটীকচাঁদ অচেতনাবস্থায় সেই ডাক্তারখানায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন, হলাহল পান। লোকে কথায় বলে, যমে মানুষে যুদ্ধ। ফটীকের অবস্থা ঠিক তাই। বিবিধ প্রক্রিয়ায় বিষ উদ্গারণ করাইয়া এক প্রকার নিরাপদ করা হইয়াছে; সে যাত্রা নিস্তার পাইবার আশা জন্মিয়াছে; কিন্তু তখনও চৈতন্য হয় নাই। আরও দুই তিন দিন গেল, অল্পে অল্পে চৈতন্যের সঙ্গে শরীরে বলাধান হইল। ডাক্তার মহাশয় তাঁহার রোগীকে বিদায় করিয়া দিলেন।

রাশিচক্রের পরিভ্রমণে সংসার-সাগরে আর এক আবর্ত্ত ফিরিয়া গেল। আমাদিগের নায়ক নায়িকারা এই দ্বাদশ মাসে কে কোথায় কি অবস্থায় রহিলেন, পাঠক মহাশয় তাহা জানিলেন না। আমরা কোথায়? একটী পল্লীগ্রামের রাস্তার পশ্চিম দিকে একখানি বাড়ী। সেই বাড়ীর উপরের একটী গবাক্ষে একটী যুবতী বসিয়া আছে। যুবতী কি বালিকা, ভাল করিয়া দেখিবার অগ্রেই গবাক্ষের দ্বার অর্দ্ধরুদ্ধ হইল। রাস্তায় কে? চিনিতে পারা গেল না। উদর স্ফীত, হস্ত পদ-শীর্ণ, মস্তকে দীর্ঘ দীর্ঘ রুক্ষ কেশ, গাভী-ভক্ষিত দূর্ব্বাক্ষেত্রের মত কপোলের উভয় পার্শ্বে রুক্ষ রুক্ষ শ্মশ্রু, সর্ব্বাঙ্গে খড়ী,

পরিধান এক খানি বিমলিন জীর্ণ বাস। পাড়ার ছেলেরা পশ্চাতে পাগল পাগল বলিয়া করতালি দিতে দিতে নৃত্য করিতেছে; পথের ধূলা লইয়া কেহ কেহ সেই গাত্রে মুষ্টি মুষ্টি বর্ষণ করিতেছে: পথিক এক এক বার দাঁত মুখ খিচাইয়া তাহাদের দিকে কট্ মট্ চক্ষে চাহিয়া দেখিতেছে, আপনা-আপনি বিড় বিড় করিয়া কি বকিতেছে, একটী কথাও বুঝা যাইতেছে না। লোকটা কে? ছেলেরা বলিতেছে, পাগল। সত্যই কি পাগল? সংসারে কে পাগল নয়? যে কবি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে পাগলা-গারদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আজ তিনি জীবিত থাকিলে জিজ্ঞাসা করা যাইত, এ পাগল কোন পাগল?

গ্রামের নাম কুণ্ডলা। পথিক পাগলের নাম ফটীকচাঁদ। অর্দ্ধমুক্ত গবাক্ষপথে যে রমণী মূর্ত্তি, সেটী শারদাসুন্দরীর—ফটীক-চাঁদের পত্নীর। বালিকা-হৃদয়ে অনুরাগ ছিল না, অনিচ্ছায় বিবাহ হইয়াছে, তথাপি স্বামী। শারদাসুন্দরীর মনে বিরাগ জন্মিয়াছে। পথে গোলমাল শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছে, পথে কে? দেখিল পাগল। চাহিয়া চাহিয়া অনেকক্ষণ দেখিল, দেখিয়া দেখিয়া চিনিল স্বামী। হয় ত দুঃখ হইল। হয় ত নয়নে দুই এক বিন্দু অশ্রু গড়াইল। আর দেখিতে পারিল না বলিয়াই হয় ত গবাক্ষ বন্ধ করিতেছিল; গবাক্ষ অর্দ্ধমুক্ত থাকিয়া গেল।

সন্ধ্যা হইল। বালকেরা হো হো শব্দ করিতে করিতে শেষ মুষ্টি ধূলা নিক্ষেপ করিয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেল। অর্দ্ধমুক্ত গবাক্ষ সজোরে অবরুদ্ধ হইল। পথিক পাগল ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া

এক দুই গণনা করিল, আকাশে পাঁচটী নক্ষত্র। কুণ্ডলা গ্রামের নিকটেই ময়ূরাক্ষী। সন্ধ্যা-সমীরে হিল্লোলিত হইয়া ময়ূরাক্ষী যেন তরঙ্গ উৎক্ষেপ করিয়া নক্ষত্র-মালাকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছে, নক্ষত্রেরা সেই হিল্লোলে মিশাইয়া জলে নামিয়াছে। সুর করিয়া উচ্চৈঃস্বরে পাগল কহিল—

"হায় রে দারুণ বিধি এই কি তোর মনে ছিল।
কাঙ্গালী করিয়া মোরে তবু সাধ না মিটিল ॥"

ফটীকচাঁদ জানিতে পারিয়াছে, ফটীকচাঁদ কাঙ্গালী। মনে মনে এক দিন রাজা হইয়াছিল, মনে মনে এক দিন রাজা স্বপ্ন দেখিয়াছিল, মনে মনে এক দিন দুটী রাণী কল্পনা করিয়াছিল; এখন সেই ফটীকচাঁদ কাঙ্গালী।

তিমির-বসনে অবগুণ্ঠিতা হইয়া সন্ধ্যাদেবী জন-পূর্ণ ধরাধামকে অন্ধকারে আবৃত করিলেন। সেই অন্ধকারে ফটীকচাঁদ কোথায় চলিয়া গেল, সংবাদ পাওয়া গেল না। ক্ষণকাল পরে গগন-ক্ষেত্রে বহু নক্ষত্র সমুদিত। নীলাম্বর যেন জ্যোতির্ম্ময় মণি মাণিক্যে খচিত। চন্দ্রও গগনে উদিত হইয়াও পৃথিবী বিভাষিত করিলেন, কিন্তু ফটীকচাঁদকে বাহির করিতে পারিলেন না।

একাদশ কল্প।

কলিকাতা—পথ-ভিখারী।

রজনী প্রভাত। আমাদিগের কবিরা যেরূপে প্রভাত বর্ণনা করেন, আমরা সেরূপে স্বভাব বর্ণনায় অসমর্থ।" প্রভাত

হইলেই আকাশে সূর্য্যোদয় হয়; জলে কমলিনী প্রস্ফুটিত হয়, মধুকরেরা গুণ্ গুণ্ করিয়া মধু পান করে; দিবাচরেরা আমোদে মত্ত হইয়া উঠে; প্যাঁচা, চোর, এবং বাদুড় প্রভৃতি নিশাচরেরা অন্ধকারের সঙ্গে গুপ্ত স্থান আশ্রয় করে; জগতের ধর্ম্মই এই। নিত্য নিত্য এই রূপেই প্রভাত হয়। সূর্য্যাস্তের পর নিত্য নিত্যই সন্ধ্যা হয়, যামিনী আইসে। রাত্রিকালে কে কে সুখী, কে কে অসুখী হয়, সংসারী জীব মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। এক জন কবি স্বভাবকে অপমান করিয়া নিশা-বর্ণনায় লিখিয়াছিলেন —

"অতএব রজনী লো তোর আগমনে।
প্যাঁচা, চোর, সুখী হয় এই দুজনে॥"

আমাদের নিশা-বর্ণনায় প্রয়োজন নাই। নিশা প্রভাত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে বেলা এক প্রহর। নূতন যবনিকা উত্তোলিত। ভারতের রাজধানী কলিকাতা সহরের তালতলা বাজার। রকমারি পোদ্দারী দোকানেরা নববধূর মত অলঙ্কার বস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়াছে। দক্ষিণে হাড়ীপাড়া লেন। বামদিকে একখানি দ্বিতল অট্টালিকা। পথে এক জন উদাসীন। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, গড়ন একহারা, দাড়ী নাই, মাথায় চুলগুলি কপালের উপর চূড়া করিয়া বাঁধা, ললাটে ভস্ম-ত্রিপুণ্ড্র, গলায় রুদ্রাক্ষমালা, দক্ষিণ বাহুতে হরিদ্রাবর্ণ ডোর অথবা তাগা, পরিধান গেরুয়া বসন, হস্তে একটি অলাবু যন্ত্র। উদাসীন সেই যন্ত্র-যোগে উচ্চ কণ্ঠে গান গাইতেছেন —

"আব দিন থোড়ি রহে, রহে না।
ভব দর্শন কি বেলা ফুরায় না॥
যাঁহা বাপ্ নেই, মাতারি নেই, ভাই নেই, ভাতিজা নেই,
যাঁহা আপ্ আপ্ একেলা আমা যানা॥"

"পথ-ভিখারী আসিয়াছে", মুখে এই কথা বলিতে বলিতে পাড়ার স্ত্রীলোকেরা, কেহ ছাদে, কেহ গবাক্ষে, কেহ বা দরজার পার্শ্বে, উপস্থিত হইতে লাগিল। ছোট ছোট বালক বালিকাগুলি রাস্তায় বাহির হইল। যাহাদের বাটীর বারাণ্ডা আছে, তাহারা বারাণ্ডায় দাঁড়াইল। পথ-ভিখারী হিন্দী গীতটী সমাপ্ত করিয়া শ্রোতৃবর্গের সকৌতুহল অনুরোধে কবির স্বরে আর একটী গীত ধরিলেন—

"তোরা দেখ্‌সে আয়, রাধা-ভক্ত শাক্ত যোগী কুঞ্জে এসেছে।
মুষ্টি-ভিক্ষা দিলে পর,
দৃষ্টি দেয় না যোগীবর,
তন্ত্রীদারের মতন যেন, তন্ত্রী দিয়ে দাঁড়িয়েছে॥
অন্য পানে নাই দৃষ্টি,
তোদের পানেই সুদৃষ্টি, (বক্র দৃষ্টি নাই),
কিন্তু জয় রাধা শ্রীরাধা বলে নয়ন জলে ভাসতেছে॥"

"ভিখারী! আর একটী গান গাও", এক গবাক্ষের রন্ধ্রপথ হইতে একটী প্রৌঢ়া কামিনী এইরূপ অনুরোধ করিলেন। "ভিখারী! আর একটী গান গাও। একটী দুর্গা-নাম কর।"

ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া উদাসীন দেখিলেন, সুন্দরী নারী-মূর্ত্তি। অনুরোধ রক্ষা করিতে হইল। স্বরে ধরিলেন—

"দুর্গে তোমার শ্রীচরণ, হয় মা আমার পিতৃধন,
আছে পিতার বুকে।
পিতা বর্ত্তমানে কিসে সেধন প্রাপ্য হয় আমাকে॥
দুর্গা যদি দয়া কোরে, শ্রীপাদ-পদ্ম দাও আমারে,
তবেই এবার ডঙ্কা মেরে কাল পরাজয় হয়ে যাই।
আমি শমন দমন, কিসে কোরব বল মা!
কাল-নিবারণ তোমার চরণ, কেমন কোরে পাই॥"

"আর একটী, আর একটী।"

উদাসীন আর একটী সুর ধরিলেন—

"ওমা শিবে।
জীবের পক্ষে যত মোক্ষ পদ,
ভোলা ক্ষেপা, সব দফা, ভুলিয়ে নিয়েছে।
ছিল আর এক ভরসা অন্তকালে
মুক্তি হবে গঙ্গায় মোলে,
জোটে ব্যাটা তাও ঘুচালে,
জটায় গঙ্গা রেখেছে॥"

উপর হইতে একটী পয়সা পড়িল। পথ ভিখারী সেদিকে দৃষ্টিপাতও করিল না। কিঞ্চিৎ দূরের এক খানি বাটী হইতে এক জন পরিচারিকা আসিয়া ডাকিল, "বৈরাগী ঠাকুর! আমাদের বাড়িতে এসো! কাপড় পাবে, পয়সা পাবে, ঢের পাবে। মা আমাদের সাক্ষাৎ কমলা!"

বৈরাগী ঠাকুর ঈষৎ বিরক্ত হইলেন। বিরক্তির সঙ্গে অট্ট অট্ট হাস্য তাঁহার আস্য-দেশে বিভাবিত হইল। কিঙ্করীকে উত্তর করিলেন, "পথ-ভিখারী কি কাহারও বাড়ীতে যায়? সংসারে আমার কিছুই প্রত্যাশা নাই।"

পরিচারিকা আবার কহিল, "বাড়ীতে না যাও, সম্মুখে দাঁড়াইয়া গান গাইবে। তোমার পায়ে পড়ি বৈরাগী ঠাকুর, একটীবার একটু এগিয়ে এসো।"

পথভিখারী এই দ্বিতীয় অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আহ্বানকারিণীর সহিত পায়ে পায়ে খানিক দূর অগ্রসর হইলেন। নেউগী পুকুরের রাস্তা। পুষ্করিণীর ঠিক উত্তর ধারে যে প্রশস্ত বাটীখানি, দাসী সেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। আগন্তুক উদাসীন বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ

বিলম্বে সেই কিঙ্করী প্রত্যাগত হইয়া, সত্য সত্যই ভিখারীর চরণ ধারণ করিল। কাকুতি করিয়া কহিল, "মা আমাদের সাক্ষাৎ কমলা। তিনি তোমায় ডাকছেন, একটীবার বাড়ীর ভিতর এসো।" ভিখারী সেই কিঙ্করীর অনুবর্ত্তী হইলেন। গান গাইতে গাইতে অনুবর্ত্তী।

"আমি ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আরও কি ক্ষমতা ধরিস সর্ব্বনাশী,
দ্বারে দ্বারে যাব,
ভিক্ষা মেগে খাব,
মা মোলে কি তার ছেলে বাঁচে না।
যত ডাকি আমি মা মা বলিয়ে,
মা বুঝি রহিলি চক্ষু কর্ণ খেয়ে,
মা বর্ত্তমানে,
এ দুঃখ সন্তানে,
বেঁচে তার কি ফল বলো মা।"

দ্বাদশ কল্প।

পুনর্দর্শন।

উদাসীন গৃহপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। ত্রস্ত পদে মুক্ত কবরীতে একটী সুন্দরী যুবতী চঞ্চল ভাবে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া উদাসীনের চরণে নিপতিত হইলেন। দাসী যাহা বলিয়াছিল, তাহাই সত্য; মা যেন সাক্ষাৎ কমলা! রোদন মুখী কমলা ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অশ্রু-প্রবাহে আগন্তুকের যুগল চরণ অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। আ স্তুক উদাসীন যেন কোন ভূত কথা স্মরণ করিয়া স্তম্ভিত ভা দাঁড়াইয়া রহিলেন। নির্নিমেষ নয়নে অবিরল অশ্রুধ

প্রবাহিত হইতে লাগিল। চরণ-পতিতা অশ্রুমতী যুবতী ভগ্নস্বরে কহিতে লাগিলেন, "পিতা! পিতা! তোমার এই অবস্থা! এ ক্ষুদ্র জীবনে আমি কত পাপ করিয়াছিলাম; তোমার এই দশা চক্ষে দেখিতে হইল! আমি পাপিনী, আমি অপরাধিনী; তোমার কথায় অবহেলা করিয়া ঐ চরণে চির অপরাধিনী হইয়াছি! কেন আমার জীবনান্ত হয় নাই! কেন ময়ূরাক্ষী আমাকে গ্রাস করে নাই! কেন আমি বাঁচিয়া আসিয়াছিলাম! পিতা! দেবতা! আমার জন্যই কি তুমি সন্ন্যাসী? তোমার নবদুর্গা মরিয়াছে! তোমার নবদুর্গা পৃথিবীতে নাই। তোমার আদরের নবদুর্গা অবাধ্য হইয়া তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে! সেই জন্যই কি তুমি সন্ন্যাসী? পাপী, পাপী, আমি মহাপাপী; পিতা আমাকে ক্ষমা কর। না—না—না, নবদুর্গা মরে নাই, নবদুর্গা এখনও বাঁচিয়া আছে।"

"আছিস! মা! মা!! মা!!! জগতে তুই বাঁচিয়া আছিস্? নবদুর্গা! প্রাণাধিকে! আদরিণী আমার! বাঁচিয়া আছিস্? উঠ! তোমার অপরাধী পিতাকে আর স্পর্শ করিও না; ছাড়িয়া দাও। পিতা বলিয়া আর আমাকে সম্ভাষণ করিও না। এ জন্মে আর যে ঐ মুখ দেখিতে পাইব, এমন আশা ছিল না। একবার উঠিয়া দাঁড়াও, চাঁদমুখ দেখিয়া ঋণশোধ বিদায় হই।"

অশ্রুমুখী নবদুর্গা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অশ্রুপূর্ণ উজ্জ্বল নয়নে পিতার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; কথা কহিতে আবেগে কণ্ঠরোধ হইতে লাগিল।

আশ্চর্য্য! ময়ূরাক্ষী-গর্ভে নবদুর্গার বিসর্জ্জন হইয়াছিল,

সেই সঙ্গে শশিকান্ত আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন ; ইহাই ত লোকে জানে, তবে নবদুর্গা কিরূপে কোথা হইতে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ? শশিকান্ত কোথায় ?

পাঠক মহাশয়, বুঝিতে পারিয়া থাকিবেন, এই উদাসীন পথ-ভিখারী বীরভূমের হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ; আর এই মুক্ত-কেশী যুবতী এই আখ্যায়িকার প্রধানা নায়িকা শ্রীমতী নবদুর্গা দেবী। কিন্তু শশিকান্ত কোথায় ? চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বদনে প্রতিধ্বনি হইল, "শশিকান্ত কোথায় ?"

বেলা দুই প্রহর। বৈশাখ মাস, সূর্য্যদেব মধ্য গগন হইতে প্রখর করজাল বর্ষণ করিতেছেন। নবদুর্গার অনুরোধে হরিপদ বাবু নিম্নতলের একটী সজ্জিত গৃহে উপবেশন করিলেন। নবদুর্গা আহার করিবার উপরোধ করিলেন, উপরোধ রক্ষা হইল না। হরিপদ কহিলেন, "আহারে আর আমার বাসনা নাই। আমি সংসার-বিরাগী উদাসীন পথিক। তুমি পরিত্যাগ করিয়া আসিবার পর আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে ; তোমাদের হারাইয়া আমি লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছি। তমাল বৃক্ষে জীবন রাখিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলাম, নিষ্ঠুর রজ্জু আমার প্রতি দয়া করে নাই। তদবধি জীবনে আমি নিরাশ হইয়াছি, আহারে আর প্রবৃত্তি নাই। নদীর জল, বৃক্ষের ফল, আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করে ; বৃক্ষতল আমাকে আশ্রয় দান করে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা আমার এই অনাবৃত দেহের উপর দিয়া চলিয়া যায়। আশ্চর্য্য ! নবদুর্গা ছাড়িয়া গিয়াছে। আমি— নবদুর্গা হারাইয়াছি, সেই পরিতাপে জীবনে আমি মায়া-মমতা-শূন্য হইয়াছিলাম। এখনও পর্য্যন্ত সেই নৈরাশ্য

আমাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। নবদুর্গা বাঁচিয়া আছে, ইহা দেখিয়াও জীবনে নূতন আশার সঞ্চার হইতেছে না। আর আমার কিছুতেই প্রয়োজন নাই; সংসারের কোন বন্ধনে বন্দী হইতে আর আমার মন চায় না। তুমি সুখী হও; আশীর্ব্বাদ করি, পুত্রবতী হইয়া সংসারে সুখ ভোগ কর। এই নরাধম পিতাকে জন্মের মত বিদায় দাও। ধন-লোভে উন্মত্ত হইয়া আমি অনেক পাপ করিয়াছি, ধন-লোভে অন্ধ হইয়া ফটীকচাঁদ রূপ কাষ্ঠে এই ললিত মাধবীলতা বেষ্টন করাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম; ধনলোভে অন্ধ হইয়াই নীচাশয় ফটীক-চাঁদের মোকদ্দমায় মাথা দিয়া রাখিবার স্থান পর্য্যন্ত হারাইয়াছি। আর আমার জীবন ধারণে কি ফল? অদৃষ্টে ছিল, হারানিধি দেখিতে পাইলাম; এখন জন্মশোধ বিদায় হই।"

নবদুর্গা রোদন করিতে লাগিলেন। বসনাঞ্চলে নেত্র মার্জ্জন করিয়া করুণ-স্বরে কহিলেন, "পিতা! জীবনে এত বিরাগ কিজন্য? এইখানে থাক; কোন কষ্ট হইবে না, তোমার নবদুর্গা যথাশক্তি সেবা করিবে। তোমার কোন কষ্ট নবদুর্গা দেখিতে পারিবে না। পায়ে ধরি, অনেক বেলা হইয়াছে, কিঞ্চিৎ আহার কর।"

"না মা! আহারের আশা আমার ভাল হইয়া গিয়াছে। সংসারের সকল সাধই ফুরাইয়াছে। আর আমি লোভে পড়িব না।"

নবদুর্গা বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বারম্বার অস্বীকার করিয়া রোদনমুখী কন্যার সাতিশয় নির্ব্বন্ধে শেষে অগত্যা কিঞ্চিৎ আহার করিতে হইল। আহারান্তে হরিপদ

পুনরায় কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই অমঙ্গলের কথা প্রচার হইবার মূল কি ?"

"সে অনেক কথার কথা।" একটী নিশ্বাস ফেলিয়া নবদুর্গা কহিলেন, "সে অনেক কথার কথা। মনে বড় ব্যথা লাগিয়াছিল। বিষ খাইয়াছিলাম।"

হরিপদ শিহরিয়া উঠিলেন। কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, 'তবে সত্যই আমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিলে ? তাহার পর কি হইল ?"

"মনে পড়ে না, অচেতন ছিলাম। বোধ হয়, মাত্রা কম ছিল ; প্রাণ যায় নাই। জলে ভাসিয়া চৈতন্য হইলে দেখিলাম শশিকান্ত আর আমি।"

"শশিকান্ত জলে ভাসিয়াছিল কেন ?"

"আগে জানিতাম না। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি, মরা নিশ্চয় করিয়া লোকেরা আমাকে চিতায় তুলিয়াছিল। প্রাণের যন্ত্রনায় শশিকান্ত সেই চিতার ঝাঁপ দিয়াছিলেন।"

"সাধু! সাধু! ধন্য প্রণয়! সাধু প্রণয়! এই বিশুদ্ধ প্রণয়ে বিঘ্ন জন্মাইবার চেষ্টা পাইয়া যথার্থই আমি কাপুরুষের কার্য্য করিয়াছিলাম। শশিকান্ত চিতায় ঝাঁপ দিলেন! তাহার পর ?"

"তাহার পর নির্জ্জল ময়ূরাক্ষী জলময়ী হইয়া আমাদিগকে ভাসাইয়া আনে।"

হরিপদের গাত্র আবার রোমাঞ্চিত হইল। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শশিকান্ত এখন কোথায় ?"

"এই স্থানেই আছেন ; কিঞ্চিৎ পরেই সাক্ষাৎ হইবে।

ভাল কথা—তুমি বলিলে, ফটীকচাঁদের মোকদ্দমায় তুমি মাথা দিয়াছিলে। কিসের মোকদ্দমা ?"

"তোমাদেরই জন্য।"

"আমাদের জন্য ? আমাদের জন্য ফটীকচাঁদের মোকদ্দমা কেন ?"

"সেই অমঙ্গলের কথা রাষ্ট্র হওয়াতে আদালত ফটীকচাঁদকে হত্যাকারী বলিয়া গ্রেপ্তার করেন।"

"কি সর্ব্বনাশ ! তাহার পর ?"

"তাহার পর আমারই সর্ব্বনাশ। ফটীকচাঁদ খালাস পাইয়াছে, কিন্তু আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে ! শুনিয়া ছিলাম, তাহার ঘরে গুপ্ত ধন পোতা আছে ; লোভে পড়িয়া তাহার মোকদ্দমায় ভদ্রাসন বন্ধক রাখিয়াও টাকা যোগাইয়া-ছিলাম। শেষে দেখি, সর্ব্বৈব মিথ্যা, সমস্তই ভুয়া কাণ্ড ! তাহার জীর্ণ গৃহ চূর্ণ করিয়া কেবল খান কতক ভাঙ্গা ইট, পচা কাঠ, নোণাধরা মাটী, আর গোটাকতক আরসুল্ল', বিছে, ও মাকড়্সা পাওয়া গিয়াছিল !"

"তাহা আমি তখনই মনে করিয়াছিলাম। ঐশ্বর্য্যের শ্রী এক প্রকার স্বতন্ত্র। ভাগ্যবানের আকৃতিতে তাদৃশ অলক্ষণ চিহ্ন কখনই থাকিতে পারে না। আচ্ছা, ফটীকচাঁদ এখন কি করে ?"

"ফটীকচাঁদ নাই।"

"নাই কি ? মরিয়া গিয়াছে ?"

"মরিয়াছে কি বাঁচিয়া আছে, বলিতে পারি না ; বহু দিন সংবাদ নাই। কুণ্ডলা গ্রামের শারদাসুন্দরীর সহিত তাহার

বিবাহ হইয়াছিল। অনেক দিন হইল, বাতুলাবস্থায় এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেই শারদাসুন্দরীর পিতৃনিকেতনের সম্মুখে ফটীকচাঁদ উপস্থিত হইয়াছিল, শারদাকে দেখিতেও পাইয়াছিল, কিন্তু কথা বার্ত্তা কিছুই হয় নাই। তদবধি নিরুদ্দেশ। শুনিয়াছি, শারদার পিতা আবার অন্য বরের সঙ্গে শারদার বিবাহ দিয়াছে।"

"সে কি? সধবার বিবাহ? তবে নিশ্চয়ই ফটীকচাঁদ বাঁচিয়া নাই। আহা! ফটীকচাঁদ মরিয়াছে! আমরা স্ত্রীজাতি, আমার মন সহজেই কাতর হইতেছে। আহা! ফটীকচাঁদের ঘর খানি ভাঙ্গিয়া দেওয়া ভাল হয় নাই। সে আমাদের মন্দকারী ছিল না। ভোজ বাজীর মত গুপ্ত ধনের গল্পে লোকের আশ্রম-পীড়া দেওয়াতে পাপ আছে।"

"লোভের নিকট পাপ পুণ্যের বিচার থাকে না। লোভ আমাকে অন্ধ করিয়াছিল, এখন অনুতাপ হইতেছে। যথা সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া এত দিনের পর চক্ষু ফুটিয়াছে। সংসার-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া এই দণ্ডীবেশে এখন আমি প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি।"

আবার নবদুর্গার চক্ষে জলধারা গড়াইল। "তবে আমিই ফটীকচাঁদের সর্ব্বনাশের মূল। আমি তাহাকে বিস্তর মনঃ-পীড়া দিয়াছি। আমার জন্য তাহাকে খুনি মামলায় জড়িত হইতে হইয়াছিল। আমারই জন্য ফটীকচাঁদ গৃহশূন্য, আমারই জন্য ফটীকচাঁদ বাতুল, এবং আমারই জন্য ফটীকচাঁদ নিরুদ্দেশ। জানিয়া শুনিয়া কখনও কোন পাপ করি নাই; কিন্তু এটী আমার মহাপাতক।"

হরিপদ কহিলেন, "এক জনের পাপ অপরে ভোগ করে না। ফটীকচাঁদের নিজের পাপ নিজেই ভুগিয়াছে। সকলেই কর্ম্ম-ফল ভোগ করে। আমার পাপে আমি যেমন ডুবিতেছি, ফটীকচাঁদও সেই রকমে কর্ম্মফল ভোগ করিয়াছে। তুমি নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল শশিকলা; তোমার অপরাধ কি?"

"আমার মন যেন বলিতেছে, আমি অপরাধিনী।"

"অমূলক কল্পনাকে মন হইতে দূর কর। যাহার ফল, সেই সেই ভোগে, ইহাই বিধি-লিপি। তুমি বৃথা কল্পনায় নির্ম্মল অন্তঃকরণকে কষ্ট দিও না।"

অপরাহ্ন। বৈশাখের প্রভাকর ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে প্রস্থান করিতেছেন, গ্রীষ্মতাপ অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। পবন এতক্ষণ গুমট গর্ম্মীতে বোধ হয় কোন গিরিগুহায় লুকাইয়াছিলেন; সূর্য্য দেবকে অস্তগমনোন্মুখ দর্শন করিয়া আনন্দে যেন হস্ত সঞ্চালনপূর্ব্বক মৃদু তালে নৃত্য করিতেছেন। সময়টী সুখকর। সংস্কৃত কবিরা কথায় কথায় বলিয়াছেন, গ্রীষ্মকালে দিবসের শেষ ভাগ অতি রমণীয়। কথা সার্থক। আকাশ পরিষ্কার। দুটী চারিটী পক্ষী আকাশের তলভাগে কৃষ্ণ রেখার মত উড়িয়া বেড়াইতেছে। এক ঝাঁক বলাকা সূক্ষ্ম শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গগন-পটের সন্নিকটে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিল। বোধ হইল, যেন সুনীল চন্দ্রাতপে শুভ্র বর্ণ ঝালর ঝুলিতেছে। কলিকাতায় এরূপ শোভা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, ভূমিকম্প ও জলস্তম্ভের মত কদাচিৎ নয়নগোচর হয়।

সূর্য্যের আর দীপ্তি নাই। পশ্চিমাকাশ লোহিত রাগে

রঞ্জিত। জগৎ-চক্ষু সহস্রাংশু অস্তশৈলের শিখরে বসিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা। সুনীল চন্দ্রাতপ অসংখ্য রত্ন-রাজিতে বিভূষিত। গৃহস্থের গৃহে গৃহে শঙ্খ-ঘণ্টা ধ্বনিত হইয়া ভক্ত-বৃন্দের মানস-ক্ষেত্রকে পরমেশ-গুণগানে অনুরাগী করিয়া তুলিল। মঙ্গলাচরণে সন্ধ্যা দেবীর আরতি হইয়া গেল। নবদুর্গার পরিচারিকা একটী বর্ত্তিকাধারে দীপ জ্বালিয়া আনিল। পিতা পুত্রীতে কত কথা হইয়াছে, সকলগুলি ভাল লাগিবে না বলিয়া পাঠক মহাশয়ের নিকট তাহার অনেকাংশ অপ্রকাশিত রাখা হইল।

ত্রয়োদশ কল্প।

বিবিধ ঘটনা।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। শশিকান্ত গৃহে আসিলেন, যে গৃহে হরিপদ এবং নবদুর্গা. সেই গৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়াই শশিকান্ত চমকিত! হরিপদ তাঁহাকে নেত্রগোচর করিয়া সস্নেহ সম্ভাষণে নিকটে আহ্বান করিলেন। নিকটবর্ত্তী হইয়া শশিকান্ত ভক্তিভাবে তাঁহার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিলেন। এবেশ কেন, জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল; আবার মনে মনে কি ভাবিয়া সে ইচ্ছাকে বাধা দিলেন। আশীর্ব্বাদ করিয়া হরিপদ কহিলেন, "সাধু! সাধু! ঈশ্বরপ্রসাদে চির জীবন সুখী হইয়া জগতের প্রিয় কার্য্য সাধন কর। তোমাদের পবিত্র প্রণয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আমার অন্তঃকরণ আনন্দনীরে

অভিষিক্ত হইয়াছে। নবদুর্গার জন্য তুমি চিতায় ঝাঁপ দিয়াছিলে, দেবলীলার ন্যায় তোমার এই প্রণয়-কীর্ত্তি জগতে চির দিন আদর্শস্বরূপ বিঘোষিত থাকুক! কল্যাণময় অনন্তদেব তোমাদের অনন্ত মঙ্গল বিধান করুন!”

শশিকান্ত পুনর্ব্বার প্রণাম করিলেন। নবদুর্গার সহিত যে যে কথা হইয়াছিল, তাহার সার সার মর্ম্মগুলি শশিকান্তের নিকটেও প্রকাশ করা হইল। শশিকান্ত একটী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, “সেই কথাই বটে, চিনি চিনি করিয়া চিনিতে পারিলাম না।”

“কাহার কথা কহিতেছ?” সহসা যেন বিস্মিত হইয়া হরিপদ প্রশ্ন করিলেন, “কাহার কথা কহিতেছ?”

শশিকান্ত উত্তর করিলেন, “কল্য বলিব।”

“কল্য আমি থাকিব না।”

“আমরা যাইতে দিব না।”

“রাখিতে পারিবে না। এখন আমি গৃহী নহি, চতুর্থা-শ্রমের আশ্রমী। অষ্ট বন্ধনের মধ্যে আর আমাকে থাকিতে নাই। গৃহে আর আমি বাস করিব না। অনন্ত পৃথিবী আমার নিবাস, অসীম আকাশ আমার ছত্র! তেমন রমণীয় গৃহ ত্রিসংসারে আর কোথায় পাইব! আমার মন এখন অনন্ত পথে ধাবিত হইতেছে। ভাগ্যে ছিল, নবদুর্গাকে আবার দেখিলাম, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিলাম, সুখে থাক। সাক্ষাৎ না হইলে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত হৃদয়ে এক নিদারুণ দুর্ভাবনার শেল বিদ্ধ হইয়া থাকিত। এখন মঙ্গলময়ের ইচ্ছা আমি তীর্থবাসী হইব। আমার পক্ষে তীর্থ-বাস ও বন-বাস

সমান। অশান্তিপূর্ণ লোকালয় এখন আর আমার আবাস-যোগ্য নয়। এই রাত্রেই বিদায় হইব।"

নবদুর্গা এবং শশিকান্ত উভয়েই বিশেষ আগ্রহে তথায় অবস্থানার্থ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, বৈরাগ্যেচ্ছার বেগ ফিরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু নদীর স্রোত যখন প্রবল বেগে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়, তখন তাহা রোধ করা কাহার সাধ্য?

রজনী ক্রমশঃ অগ্রবর্ত্তিনী। এক প্রহর, দেড় প্রহর, ক্রমে প্রায় দুই প্রহর সমাগত। গৃহস্থ সকলে নিশা-কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া বিশ্রামার্থ শয্যা আশ্রয় করিলেন। প্রভাতে নবদুর্গা দেখিলেন, পিতৃ-শয্যা শূন্য রহিয়াছে, তিনি অদৃশ্য।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় উদাসীন হইয়া আসিয়াছিলেন,উদাসীন হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, আর সন্ধান পাওয়া গেল না। শশিকান্ত ব্যগ্রভাবে সহরের অনেক স্থানে অন্বেষণ করিলেন, কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না। নবদুর্গা অত্যন্ত কাতর হইলেন।

পাঠক মহাশয় এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সত্যই কি শারদাসুন্দরীর পুনর্ব্বার বিবাহ হইয়াছে?—সত্য। শারদা-সুন্দরীর পিতা ফটীকচাঁদের জন্য অনেক দিন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, আশার আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া অনেক দিন মুখ চাহিয়া রহিলেন, কিছুই সংবাদ পাইলেন না; স্থির হইল, মৃত্যু। শারদাসুন্দরী বালিকা, বালিকাকে আজীবন বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে রাখা ধার্ম্মিক পিতার কর্ত্তব্য বোধ হইল না। বিশেষতঃ বিধবা-বিবাহের প্রতি তাঁহার অকপট পক্ষপাত ছিল। পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া পাঁচতোপি গ্রামের একটী

সুপাত্রের হস্তে শারদাকে পুনঃ-সম্প্রদান করিলেন। কটীকচাঁদের সহিত সাযুজ্য সম্মিলন হয় নাই। তাঁহারা মনে মনে ক্ষুণ্ণ ছিলেন, এইবার দুহিতাকে সৎপাত্রে সমর্পণ করিয়া সুখী হইয়াছেন।

চতুর্দ্দশ কল্প।

পাগল।

বৎসরের আর এক আবর্ত্তন ফিরিয়া গেল। নবদুর্গা শুভক্ষণে একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। এক দিন অপরাহ্ণে আপন গৃহের ছাদে পুত্রটী কোলে করিয়া পাদ-বিহার করিতেছেন, এমন সময় নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, রাস্তায় লোকারণ্য। অসম্ভব ভিড়। একটা লোক জীর্ণ শীর্ণ কলেবরে, রুক্ষ কেশে, মধ্য স্থলে দণ্ডায়মান। পরিধান ছিন্ন কৌপীন; গলায় স্থূল-সূত্র-বদ্ধ একটা তামার মাদুলী। লোকেরা হো হো করিয়া হাততালি দিতেছে; কৌপীনধারী নীরব, নিশ্চল। নবদুর্গা চাহিয়া চাহিয়া অনেকক্ষণ দেখিলেন, চিনিতে পারিলেন না। মুখের চেহারায় এক একবার একটু একটু মনে আইসে, স্মৃতি যেন আবার ঢাকা পড়িয়া যায়। নীচে নামিলেন। গবাক্ষপথে অনেকক্ষণ উঁকি মারিয়া নিরীক্ষণ করিলেন, চিনিতে পারিলেন না। দাসীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, কাহাকে লইয়া তামাসা করিতেছে।"

দাসী চলিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "একটা পাগল গো পাগল! তাজার কথায় কথা কয় না, প্রহার করিলেও কাঁদে না; কেবল এক একবার বিকট মুখ-ভঙ্গী করিয়া কীল দেখায়। কিন্তু পাগলটী বেশ শান্ত, কাহাকেও মারে না, ধরে না, গালাগাল দেয় না, কিছুই না। লোকেরা কোথা হইতে তাড়াইয়া আনিয়াছে, জানিতে পারা গেল না।"

"পাগল? অমন করিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছে, ও কি পাগল? আমার বিবেচনা হয়, পাগল না, আর কিছু।"

"তা বুঝি হয় না? যে সকল পাগল কথা কয় না, গুম্ হইয়া থাকে, লোকে তাদের গুমো পাগল বলে।"

"না লো না! ও পাগল নয়। যখন ভিড় সরিয়া যাইবে, তুই একবার ওকে ডাকিস। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিব, কেন অমন অবস্থা ঘটিয়াছে। মনে হয়, যেন উহাকে আর কোথাও দেখিয়াছি। ভাল করিয়া চিনিতে পারিতেছি না। নিকটে আসিলে পরিচয় পাইলে বোধ করি চিনিতে পারিব। তুই ডাকিস্।"

"না বাপু! আমার কর্ম্ম নয়! যদি কাম্ড়ায়!"

নবদুর্গা হাস্য করিয়া কহিলেন, "পাগলে কাম্ড়ায় না। পাগলেরা মানুষ। কুকুর নয়, শেয়াল নয়, বাঘ নয়, কাম্ড়াবে কেন? আর তুই ত এই মাত্র বলি, পাগলটী বেশ শান্ত। কোন ভয় নাই। তুই ডাকিস্।"

কিঙ্করীর নাম গয়েশ্বরী। সন্ধ্যা হইবার কিছু পূর্ব্বে ভিড় কমিয়া গেল। কৌপীনধারী ধীরে ধীরে নেউগী পুকুর রাস্তার

পূর্ব্ব দিকে যাইতে লাগিল, পশ্চাতে গয়েশ্বরী। পাগল এক-বার মুখ ফিরাইয়া চাহিল, চাহিয়াই আপন মনে হন্ হন্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। অবসর বুঝিয়া গয়েশ্বরী ডাকিয়া কহিল, "ওগো! আমাদের মা ঠাকুরুণ তোমায় এক বার ডাক্‌ছেন' আমাদের বাটীতে এসো।"

মস্তক সঞ্চালন করিয়া পাগল আরও দ্রুতগতি পূর্ব্বাভি-মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে গিয়া গয়েশ্বরী আবার ডাকিল। নিকটে, পার্শ্ব-গৃহের দ্বারে এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি সম্মুখে আসিয়া সেই লোককে কহিলেন, "দেখিতেছি, তুমি ভিখারী, নিরাশ্রয়। যিনি ডাকিতেছেন, তিনি পরম দয়াবতী, সতী লক্ষ্মী। যাও, কোন সন্দেহ করিও না, মনে ভয় রাখিও না, উপকার হইতে পারিবে।"

পাগল ফিরিয়া দাঁড়াইল। আকার ইঙ্গিতে বোধ হইল, সম্মত। গয়েশ্বরী পথ দেখাইয়া চলিল, মৃদু-পদে পাগল পশ্চাদ্‌গামী।

বাটীতে উপস্থিত। নবদুর্গা নিম্নতলের পার্শ্ব-গৃহেই ছিলেন; সম্মুখের বারাণ্ডায় পাগল আসিয়া দাঁড়াইল। নবদুর্গা তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া যেন চিনিতে পারিলেন, বোধ হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পাগল?" অস-ম্মতি-সূচক মস্তক হিল্লোলিত করিয়া মৌনভাবেই পাগল তাঁহার প্রশ্নের উত্তর করিল।

"তবে তুমি কি? তোমার এমন শীর্ণ শরীর কেন? এমন বেশই বা কেন?"

পাগল কথা কহিল না। নবতুর্গা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলিকাতাতেই কি তুমি থাক ?"

পাগল উত্তর করিল না। নবতুর্গা চতুর্থ বার প্রশ্ন করিলেন, "তোমার গলায় ও মাতুলিটী কিসের ?"

পাগল এক বার ললাটে ও এক বার বক্ষে হস্তার্পণ করিল।

কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিত ভাবে নবতুর্গা কহিলেন, "বোসো।"

গ য়েশ্বরীর দিকে গৃহলক্ষ্মী ইঙ্গিত করিলেন। গয়া এক খানি কাষ্ঠাসন আনিয়া দিল, পাগল উপবেশন করিল।

পুনরায়, কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখ পানে চাহিয়া থাকিয়া নবতুর্গা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু আহার করিবে ?"

পাগল আপন উদরে হস্ত প্রদান করিল।

ইঙ্গিত মাত্রে কিঙ্করী কতকগুলি খাদ্য সামগ্রী আনিয়া দিল। বহু দিনের পর উদর পূর্ণ করিয়া জীর্ণ রোগী প্রচুর আহার করিল।

আহারান্তে নবতুর্গা প্রফুল্ল বদনে, প্রফুল্ল নয়নে, তাহার মুখ পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আর কখন আমাকে কোথাও দেখিয়াছ ? ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ দেখি, স্মরণ করিয়া দেখ দেখি, আমাকে কি চিনিতে পার ?"

মৌন বাতুলের মৌন ভঙ্গ হইল। মৃতুস্বরে কহিল, "আর কখনও আমি সহরে আসি নাই। তুমি সহরের মেয়ে, তোমাকে কি রূপে চিনিব ?"

"আমি যদি সহরের মেয়ে না হই, তাহা হইলে চিনিতে পার ?"

কোটরাভ্যন্তর্গত চক্ষু যত দূর বিস্ফারিত হইতে পারে, তত দূর বিস্তৃত করিয়া সম্ভাষিত রোগী পুনঃ-পুনঃ-প্রশ্নকারিণীকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিল। বিমর্ষ বদনে উত্তর দিল, "মনে হইল না।"

ঈষৎ হাস্য করিয়া নবদুর্গা শেষ বার প্রশ্ন করিলেন, "ময়ূরাক্ষী নদী মনে হয়, নদী-তীরের উদ্যান মনে পড়ে? বালির চড়ায় চিতা-সজ্জা মনে আছে?"

পাগলের শীর্ণ কলেবর ভয়ে, বিস্ময়ে, কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর করিল, "তুমি—তুমি! তুমি নবদুর্গা! তুমি এখানে! তুমি বাঁচিয়া আছ! নবদুর্গা! ওঃ! তোমার জন্য——"

"সে সমস্ত আমি শ্রবণ করিয়াছি। তোমার অত কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। তোমার দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইতেছে।"

পাঠক মহাশয়, বোধ হয়, এতক্ষণে বুঝিলেন, এই কৌপীন-ধারী উন্মত্ত-বেশী রোগী, আপনার পূর্ব্ব-পরিচিত কাশ-রোগ-গ্রস্ত গঞ্জিকা-ভক্ত বীরভূম-নিবাসী ফটীকচাঁদ অধিকারী। ইহার পূর্ব্বাপর সমস্ত অবস্থাই আপনার সুবিদিত আছে। শেষ অথবা বর্ত্তমান অবস্থা এই রূপ। শারদা সুন্দরীর পিতা অনুমানে স্থির করিয়াছিলেন, ফটীকচাঁদের মৃত্যু হইয়াছে। এখন নেত্র-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল, ফটীকচাঁদের মৃত্যু হয় নাই। পতি বর্ত্তমানেই শারদা সুন্দরী দ্বিতীয় পাত্রে সমর্পিত হইয়াছে। অভিনব পদ্ধতির পরিণয়!

নবদুর্গা পিতৃমুখে শুনিয়া ছিলেন, নূতন পাত্রে শারদা-

সুন্দরী সমর্পিত হইয়াছে। ফটীকচাঁদের নিকট সে কথা প্রকাশ করিলেন না। পাছে ফটীকচাঁদ মনে কষ্ট পায়, এই ভাবিয়া সে কথাটী তখন চাপিয়া রাখিলেন। কি কথা বলিয়া ফটীকচাঁদকে তদবস্থায় সান্ত্বনা প্রদান করিবেন, মৌন-ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ কল্প।

পরিণাম।

কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া নবদুর্গা কহিলেন, "ফটীকচাঁদ! আমার জন্য তুমি বিস্তর কষ্ট পাইয়াছ। পিতা আসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে আমি সমস্তই শুনিয়াছি। তোমার জন্য তিনি সমস্ত সম্পত্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া গৃহত্যাগী ও দেশত্যাগী হইয়াছেন। তাঁহাকে রাখিবার জন্য বিস্তর আকিঞ্চন পাইয়াছিলাম, কিছুতেই থাকিলেন না; রাত্রিকালে আমাদের অজ্ঞাতে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, কিছুই জানি না। আমার বুকে যেন শেল ফুটিয়া রহিয়াছে। ফটীকচাঁদ! তোমার অবস্থা দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইতেছে। ধরিতে গেলে আমি অভাগিনী, আমিই তোমার সমস্ত কষ্টের মূল। তুমি এক কর্ম্ম কর। চিকিৎসা করাও। কত লোকের ব্যামো হয়, তাহা কি আর ভাল হয় না? তুমি চিকিৎসা করাও। বিবাগী হইতেছ কেন? পাগলের মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ কেন? দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইতেছে। ঔষধ পথ্যের খরচ আমি দিব; তুমি চিকিৎসা করাও।"

"আমার চিকিৎসা নাই।" দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ফটীকচাঁদ কহিলেন, "আমার চিকিৎসা!"

"কেন?" চকিত হইয়া বিস্মিত ভাবে নবদুর্গা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? তোমার চিকিৎসা নাই কেন?"

"থাকিতে পারে; কিন্তু ওকথা বলিতে নাই। আমি তারকনাথের ডোর বাঁধিয়াছি; দেবতার স্বপ্নপ্রাপ্ত ঔষধ ধারণ করিয়াছি। তুমি যে তখন জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, 'তোমার গলায় ওটা কিসের মাদুলী?' এই দেখ, এই মাদুলীতেই সেই দেবদত্ত মহৌষধ। দৈব ঔষধের কাছে অন্য ঔষধ কিছুই নাই। এই ঔষধেই আমি বাঁচিয়া উঠিব।"

অহো! জীবের জীবিতাশা কি বলবতী! জগতে মানুষ যতই কেন যন্ত্রণা ভোগ করুক না, যতই কেন বিপদে পড়ুক না, মহা মহা শোক দুঃখে যতই কেন অভিভূত হউক না, নিদারুণ নৈরাশ্য-কবলে পুনঃ পুনঃ যতই কেন বিগ্রাসিত হউক না, সাংঘাতিক আধি-ব্যাধিতে যতই কেন জর্জ্জরিত হউক না, মানুষ মরিতে চায় না। এক একবার বড় যন্ত্রণার সময় বিধাতাকে নিন্দা করে, অদৃষ্টের দোষ দেয়, যমরাজকে আহ্বান করে, আপনা আপনি মরি মরি বলে, কিন্তু সম্মুখে বিভীষিকা দেখিলেই শিহরিয়া উঠে। যে গল্পে বনমধ্যে কাঠুরে যমকে ডাকিয়া কাষ্ঠের বোঝা মাথায় তুলিয়া দিতে বলিয়াছিল, সেই গল্প অনেক অভাগা মানুষের হৃদয়ে অহরহ জাগে। সাক্ষী এই ফটীকচাঁদ। পাঠক মহাশয় ভাবিয়া দেখুন, এই ফটীকচাঁদের কি দুর্দ্দশাই না হইয়াছে। জীর্ণ গৃহে বাস, স্বয়ং প্রভু, স্বয়ং ভৃত্য, স্বয়ং পাচক। অহিফেন ও গঞ্জিকাধূমের সেবা; দুর্লভ

বস্তুতে অভিলাষ; লোকের নিকট তিরস্কার লাভ; আশা ভঙ্গ; প্রণয় ভঙ্গ; ফৌজদারি মোকদ্দমা, ছোটখাট মোকদ্দমা নয়, খুনী মামলা; অপরিমিত ঋণগ্রস্ত; ভিটা মাটী নাশ; গুপ্তধনের আশা জলশায়িনী, উন্মাদ দশা প্রাপ্ত; উদরান্নের জন্য লালায়িত;—পথের ভিখারী; স্বয়ং জীবিত থাকিতে পাত্রান্তরে পত্নী সম্প্রদান; নিরাশ্রয়ে ও নিরাহারে লোকের বিদ্রুপ ও করতালির সঙ্গে পথে পথে পরিভ্রমণ, তাহাতে কাশ রোগ-গ্রস্ত; দুরবস্থার চরমাবস্থা! তথাপি ফটীকচাঁদ বাঁচিতে চায়! তথাপি ফটীকচাঁদ তারকেশ্বরের ডোর বাঁধিয়াছে, গলায় দৈব ঔষধ ধারণ করিয়াছে! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

অথবা আশ্চর্য্যই বা কি?—জগতে কেহই মরিতে চায় না। একটী মশাকে মারিতে যাও সে পলায়ন করিবে; একটী পিপীলিকাকে মারিতে যাও, সেই ক্ষুদ্র জীব তৎক্ষণাৎ প্রাণ-ভয়ে পলাইয়া যাইবে;—জগতে কেহই মরিতে চায় না। বিশ্বমোহিনী মায়া! তোমাকে নমস্কার! পৃথিবীর মায়া সকলেরই সমান। বিশ্বমোহিনী জীবন-তৃষ্ণা! তোমাকেও শত শত নমস্কার!

বাঁচিয়া থাকিবার অভিলাষে ফটীকচাঁদ দৈব ঔষধ ধারণ করিয়াছে, এই শেষ কথাটী শুনিয়া নবদুর্গার নেত্রপুট সহসা নিমেষশূন্য হইল, সর্ব্বগাত্রে রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল; কিয়ংক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। মনে মনে ক॰ কি আন্দোলন করিয়া অবশেষে চকিতভাবে ধীর মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফটীক চাঁদ! তুমি কি শারদাসুন্দরীকে বিবাহ করিয়াছিলে?"

প্রশ্নটী সমাপ্ত হইবামাত্রেই শশিকান্ত সেই স্থানে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। ফটীকচাঁদ এতক্ষণ বসিয়াছিলেন, অকস্মাৎ উদাস নয়নে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া আকস্মিক ভয়ে যেন বিদ্যুৎবেগে লম্ফ দিয়া দাঁড়াইলেন। "ভূত! ভূত! ঐ ভূত! আমি ইহাকে—না—না—আমি—হাঁ—আমি ইহাকে খুন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম; সেই রাগে আমাকে খাইতে আসিয়াছে! ঐ—ঐ!—ঐ খায়! এই খেলে! ওঃ! ভূত! আপনি মরিয়াছিল! আপনি ভূত হইয়াছে! আমি—আমি, হাঁ—ভূত! নবদুর্গা পেত্নী! দুজনেই ভূত! আমি এতক্ষণ কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম! ওঃ! পেত্নীর সঙ্গে—পেত্নীর সঙ্গে! না—না—আমি বিবাহ করি নাই! শারদা মরিয়াছে! শারদাও পেত্নী হইয়াছে! ঐ—ঐ—ঐ আসিতেছে! ঐ রাঙ্গা কাপড়! ঐ বিকট হাসি! ঐ এলো চুল! ঐ যে দেয়াল ফাটিয়া গেল! ঐ যে ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িল! পেত্নী আসিতেছে! হাসিতে হাসিতে আসিতেছে! আমার ঘাড় ভাঙ্গিতে আসিতেছে! না—না—আমি—"

এইরূপ প্রলাপ বকিতে বকিতে ফটীকচাঁদ যেন নক্ষত্র গতিতে ছুটিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল; এক দৌড়ে সদর রাস্তায়। শশিকান্ত স্তম্ভিতভাবে বিস্মিত নয়নে এই ব্যাপার দর্শন করিয়া ত্বরিত স্বরে নবদুর্গাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটা কে? সেই ফটীকচাঁদ না? ওঃ! ইহাকেই আমি সেদিন পটলডাঙ্গা কলেজের সরোবরকূলে দেখিয়াছিলাম বটে! আহা! লোকটা এককালে নষ্ট হইয়া গিয়াছে!"

নবদুর্গা উত্তর করিবার অগ্রে রাস্তায় একটা ভারী গোলমাল উঠিল। সেই গোলের মধ্যে কয়েকবার উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত

হইল, "নবদুর্গা, নবদুর্গা, নবদুর্গা !" নবদুর্গা শঙ্কিতচিত্তে ব্যস্ত হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন ; শশিকান্তও সন্দিগ্ধভাবে চঞ্চলপদে বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সদর দরজার কপাট অর্দ্ধাবৃত করিয়া নবদুর্গা দাঁড়াইলেন। দেখিলেন কি ! ভয়ঙ্কর দৃশ্য ! একটা "মিউনিসিপ্যাল মহিষ ক্ষিপ্ত হইয়া পূর্ব্বমুখে দৌড়িয়াছিল, সম্মুখে পড়িল "ফটীকচাঁদ"। দুরন্ত মহিষ দুই তিনবার বক্রশৃঙ্গে ফটীকচাঁদের উদর ও পার্শ্বদেশ বিদারণ করিতে লাগিল। লোকেরা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কেহই অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। মহিষের খুর শৃঙ্গাঘাতে তিলেকের মধ্যে হতভাগ্য ফটীকচাঁদ এককালে জীবন শেষ হইয়া গেল ! সমস্ত যন্ত্রণার শেষ হইল। যম ! যম ! বলিয়া নবদুর্গা হায় হায় করিতে লাগিলেন। মৃত্যুকালে ফটীকচাঁদ বারম্বার ক্রন্দন করিয়া ডাকিয়াছিল, "নবদুর্গা ! নবদুর্গা ! ! নবদুর্গা ! ! !"

সমাপ্ত।

REGIS
ANGLIÆ